তুতনখামেনের রাণী

শ্রীপারাবত

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
এপ্রিল-১৯৬২

প্রকাশিকা ঃ
অঞ্জনা জানা
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
সুধীর মৈত্র

মুদ্রক ঃ
ইউনাইটেড প্রিন্টার্স
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীমান মুক্তীশচন্দ্র লাহিড়ী

স্নেহাস্পদেষু

॥ লেখকের কয়েকটি বই ॥

আরাবল্লী থেকে আগ্রা
মমতাজ দুহিতা জাহানারা
মেবার বহ্নি পদ্মিনী
বাহাদুর শাহ
মগধ যুগে যুগে
রণস্থল মারোয়াড়
মুর্শিদকুলি খাঁ
রাণাদিল
চিতোর গড়
রাজপুত নন্দিনী
আমি সিরাজের বেগম
অযোধ্যার শেষ নবাব

ভূমিকা

নীলনদ বিধৌত মিশরেই প্রথম ঘটে পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতার উন্মেষ। সময়-কাল আনুমানিক ৩০৯০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। তখন থেকেই এখানে রাজবংশের পত্তন। এই সব রাজাদের বলা হত ফ্যারও বা ফারাও। সেই সুদূর অতীতেই এখানে পিরামিড নির্মাণের অসামান্য কলাকৌশল আবিষ্কার করেছিলেন মিশরবাসীরা। পিরামিডগুলো হল সমাধিসৌধ। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যাতে অবিকৃত অবস্থায় চিরস্থায়ী হয় সেইভাবে পিরামিডের ভেতরে সংরক্ষিত করা হতো। সঙ্গে থাকত জীবিতকালের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী, ভোগ্যবস্তু, রত্নরাজি ইত্যাদি। যাতে মৃত্যুর পরেও মৃত রাজা সেগুলি ভোগ করতে পারেন।

এই অবিকৃত দেহগুলিই হল মমি। কত শত মমি অপহৃত হয়েছে সেই সঙ্গে খোয়া গিয়েছে মমির নিকট রক্ষিত রত্নভাণ্ডার। এই রকমই একটি মমির সমাধিস্থল আবিষ্কৃত হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর একজন সাধারণ শ্রমিকের কুঁড়ে ঘরের নীচে। আবিষ্কার করেন হাওয়ার্ড কার্টার নামে একজন ইংরাজ। তিনি যখন এটির সন্ধান পান, তার আগে থেকেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছিলেন যে রাজন্যবর্গের উপত্যকা নিঃশেষিত। সেখানে নতুন কোন সমাধির সন্ধান পাওয়া যাবে না।

ঠিক সেই সময় আবিষ্কৃত হল কিশোর ফ্যারও তুতনখামেনের মমি, যিনি ১৩৫১ খৃ.পূ. থেকে ১৩৬১ খৃ. পূ., এই দশ বৎসর মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যু এসে যখন তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিল তখন সবে তাঁর যৌবনের সূচনা। হাওয়ার্ড কার্টারের আবিষ্কারের বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য সমাধিস্থলগুলো যেমন বহুপূর্বেই তস্কর দ্বারা লাঞ্ছিত, এটি তেমন নয়। তুতনখামেনের সমাধি কেউ স্পর্শ করেনি আগে। বোধ হয় তাঁর জন্য কোন সুদৃশ্য সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল না বলে। কার্টারও সেটি খনন করেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে যাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। সেখানে আবিষ্কৃত প্রতিটি সামগ্রী নথিভুক্ত করা হয়। ফলে সেই সুদূর অতীতের অনেক কিছুই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তুতনখামেন তাঁর আত্মীয় পরিজন, রাজকর্মচারী কারও কাছে তেমন গুরুত্ব পান নি বোধহয় তাঁর বয়সের জন্য। তাঁর পত্নী তাঁকে সাধ্যমত

ঘিরে রাখতেন। কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না। তাই মৃত্যুর পরে বড় অবহেলায় এবং তাড়াহুড়ো করে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তেমন কোন সৌধও নির্মান করা হয়নি। তবুও আজ তুতনখামেনের প্রসিদ্ধি সব চাইতে বেশী। এইভাবে যেন তিনি তাঁর প্রতি চরম অবহেলা আর ঔদাসীন্যের যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছেন মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পরে।

শ্রীপারাবত

সব সময় এক অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপে অনখেসেন অটেনের কতই বা বয়স তার? কৈশোর অতিক্রম করতে চলেছে সবে। সে নাকি অপরূপা রূপসী। মা নেফেরতিতির চেয়েও। একথা বিশ্বাস হয়না তার। আরও ছোটবেলায় মায়ের মুখের দিকে সে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকত। মা বলতেন, কি দেখছিস অত? লজ্জিত হয়ে সে উত্তর দিত, তোমাকে। মা হেসে তার গাল টিপে দিয়ে চলে যেতেন। দুদণ্ড কি মেয়ের কাছে বসার উপায় ছিল? কত কাজ তাঁর। তিনি যে মিশরের ভাগ্যবিধাতা ফ্যারওর পত্নী। তিনি রাজ্ঞী। তাছাড়া তাঁর রয়েছে আরও পঞ্চকন্যা।

অনখেসেন-অটেনের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নাম মার্ত-অটেন। সে-ও কম সুন্দরী নয়। মার্ত-এর পরের জন হল মকত-অটেন। সে তো জীবন্মৃত। চিররোগী সে। একটি অন্ধকার কক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে দিনের পর দিন কাটে তার। এখন থেকেই সে যেন পিরামিডের অভ্যন্তরে সমাধিস্থ। প্রাসাদের মানুষগুলোর মনের ভেতরেও বুঝি ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজ করছে। সব সময় প্রচ্ছন্নভাবে একটা কিছু ঘটে চলেছে। চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, অথচ অনুভব করা যায়। ভীষণ ভয় করে তার মাঝে মাঝে। একটা ষড়যন্ত্র যেন—একটা চক্রান্ত। কিসের চক্রান্ত বুঝতে পারে না। মায়ের ওই সুন্দর চোখের দৃষ্টির মধ্যেও অস্থিরতা। পিতা অখেন-অটেন মাঝে মাঝে পাগলের মত ব্যবহার করেন। চিৎকার করে ওঠেন। বলেন,—আমি মিশরের ফ্যারও, সবার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নীলনদের স্রোত আমার আদেশে প্রবাহিত হচ্ছে। আমি অটেনের জীবন্ত প্রতিনিধি। আমি তাঁর পুত্র।

পিতার এই চিৎকারে শঙ্কিত হয় অনখেসেন। তার চেয়ে সে যখন বাঁদীদের সঙ্গে খর্জুর বীথিকার নীচ দিয়ে বালুকাময় প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় তখন খোলা হাওয়ায় তার মনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। নিজেকে ভীষণ হালকা লাগে। প্রাসাদের কথা মনেও থাকেনা। ভাবে, পৃথিবীটা কি সুন্দর।

কিন্তু বড় অস্থায়ী এই সময়টুকু। প্রাসাদে ফিরে আসার কথা মনে হতেই মন আবার ভারী হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরে বাসা বাঁধতে থাকে সেই অজানা শঙ্কা। প্রাসাদে ফিরলে একটা কালো ছায়া তাকে ঘিরে ধরতে চায়—টুঁটি চেপে ধরতে চায়।

এই সময় একদিন শোনা গেল, তাদের বৈমাত্রেয় ভাই স্মেনখকরের সঙ্গে মার্ত-অটেনের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। শুনে মনটা বেশ খুশী খুশী হয়ে উঠল। ভালই হবে। ভাইদের সঙ্গে বোনেদের বিয়ে হলে খুব মজা। বাইরে কোন অজানা

পরিবারে চলে যেতে হয় না। তাই বোধহয় তাদের বংশে প্রথাটা চালু হয়েছে। তাদের পিতামহ তো নিজের কন্যাকেই বিয়ে করে বসেছিলেন। কাকে সম্প্রদান করবেন কন্যা ? অমন অভিজাত পরিবারই বা কোথায় ? বিবাহ দিতে হলে সেই সুদূরে। সেই সিনাই কিংবা আরও কোন দূর দেশে। অনখেসেন জানে, স্মেনখকরে হবে পরবর্তী ফ্যারও। অর্থাৎ মার্ত হবে সম্রাজ্ঞী—এখন তাদের মা নেফেরতিতি যেমন।

স্মেনখকরের সঙ্গে বিবাহের সংবাদে প্রসন্ন তার অন্তরকে মার্ত-অটেনই আবার দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলল।

বলল—যার বিয়ে তার চেয়ে তোরই দেখি বেশী আনন্দ।

—কেন ? তোর হচ্ছে না ?

—কি জানি।

—বাঃ, এ আবার কেমন কথা।

—তুই জানিস, মায়ের সঙ্গে ফ্যারওর ঝগড়া চলছে ?

—ঝগড়া ? জানিনা তো।

—বাবা মাকে একটুও সহ্য করতে পারে না।

—কিন্তু আমি যে শুনেছি—

—শুনেছিস, মায়ের ওপর বাবার অগাধ ভালবাসা। ওসব কথা ভুলে যা। ওসব প্রথম জীবনের ব্যাপার।

—কিন্তু মা তো এখনো সুন্দরী।

—তাতে এসে যায় না। বিরোধটা হয়েছে ধর্ম নিয়ে। বাবার বিশ্বাসকে মা এখন আর কিছুতে মানতে পারছেনা।

—কেন ?

—অটেন দেবতাকে মায়ের পছন্দ নয়।

—সেকি ! অটেন দেবতা যে সর্বব্যাপী। তিনি যদি প্রতিদিন উদিত না হতেন তাহলে পৃথিবী চিরকাল অন্ধকার থেকে যেত।

—এতো শোনা কথা বলছিস। তুই কি কিছু বুঝিস ?

— আমি কি করে বুঝব ?

— তবে ? আমি একটু একটু বুঝি। পড়াশোনা করছি। প্যাপাইরাসের ওপর লিখতে শিখেছি আজকাল।

— সত্যি ? কে শেখালো ?

বোন মার্ত সলজ্জ হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে—বলতো কে ?

—আমি কি করে বলব ?

—স্মেনখকরে।

—ওমা, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখব তো।

—খবর্দার। ও বলতে মানা করেছিল। বলেছিল ফ্যারওর স্ত্রী হতে হলে একটু একটু করে লেখাপড়া শিখে রাখা ভাল।

—তাই বুঝি ? ইস, আমারও ফ্যারওর রাণী হতে ইচ্ছে করছে।

—ইচ্ছে করলেই তো হলো না। ভাগ্য থাকা চাই। অটেনের আশীর্বাদ।

—মা, এই দেবতাকে পছন্দ করেন না। কাকে করেন তবে ?

—সেই আদি কালের অমেন দেবতাকে।

—তিনি কে ?

—জানিনা। মা তো বলেন, তিনিও ওই একই সূর্য দেবতা। রা নামে যাঁর পরিচয় ছিল এককালে।

—কিন্তু ফ্যারওর সঙ্গে এমন করা কি উচিত ?

—কখনো না।

—তুই তাহলে মাকে বুঝিয়ে বল। মা শুনবে।

—আমি বলেছি। মা শোনেনি। মা বোধহয় ভাবেন, যতদিন তাঁর রূপ রয়েছে, বাবা তাঁর বশীভূত। স্মেনখকবে হেসে হেসে বলে, পুরুষদের তো তোমার মা চেনেন না। আমার মা হাড়ে হাড়ে চিনত। আমার মা রাণী হবার জন্যে জন্মায় নি। সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিল। তাই অকালে মরল।

অনখেসেন বলে—একথার অর্থ।

—অতি সহজ। রূপের অত দেমাক ভাল নয়।

—আমি আজই মাকে বলব।

—না। তোকে কিছু বলতে হবে না।

অনখেসেন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে—আমার কেমন ভয় ভয় করে।

মার্ত-অটেন বলে—আমার কথায় কথায় অত ভয় করে না। ভয় পেলে রাণী হওয়া যায় না।

—তুই মাকে ভালবাসিস ?

—না।

অনখেসেন অবাক হয়। কারণ মা নেফেরতিতি তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেও তাঁর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব না করে পারে না সে। জানে সে, ওই সুন্দরী নারীর গর্ভে একদিন সে স্থান পেয়ে তারই রক্তে মাংসে গড়ে উঠেছিল

তিল তিল করে। হয়ত স্তন্য পানও করেছিল মায়ের। সঠিক জানেনা সেকথা। কারণ পূর্বদেশ থেকে নিয়ে আসা অনেক ক্রীতদাসীর বুকেও দুধ থাকে। তবু নেফেরতিতি যে তার মা একথা তো কেউ অস্বীকার করবে না। একথা ভাবতেও ভাল লাগে। সে লক্ষ্য করেছে মায়ের ওই প্রখর ব্যক্তিত্বের আবরণ একটু সরিয়ে দিতে পারলে মরূদ্যানের ইঙ্গিত মেলে। কত সময় সে মনের ভয়কে জয় করে মাকে জড়িয়ে ধরেছে। খুব শৈশবে মা তার গাল টিপে দিয়ে একটু হেসে চলে যেতেন। কিন্তু বড় হবার পরও এভাবে জড়িয়ে ধরলে রূঢ়ভাবে কখনো ঠেলে দিতে পারেন নি।

একটু হেসে প্রশ্ন করেছেন—কি হ'ল, জড়িয়ে ধরলি যে ?

—এমনিতে। রাগ করলে মা ?

—না। ছেড়ে দে। কাজ আছে অনেক।

তবু মার্ত মাকে ভালবাসেনা। অনখেসেন মুচকি হেসে বড় বোনকে দুষ্টুমী করে বলে—মাকে না হয় ভাল না বাসলি। কিন্তু স্মেনখকরেকে ?

—তাকেও ভালবাসিনা।

প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনি খায় অনখেসেনের মন। সে বলে—কি বললি ?

—ঠিকই শুনেছিস। ওকে ভালবাসি না।

—অথচ ওকে তুই বিয়ে করবি ওর পত্নী হবি। শুনছি ফ্যারও ক'দিন পরে ওকে সহশাসক করে নেবেন। তার মানে, তখন তুই রাণীও হবি।

এবারে মার্ত খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে। বলে—তাতে কি হয়েছে ? রাণী হবার সঙ্গে ভালবাসার কি সম্পর্ক ? তোর কি তাই ধারণা ? দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। একটার সঙ্গে আর একটার সম্পর্কই নেই।

অনখেসেন ভেবে পায় না কি উত্তর দেবে। আসলে ভালবাসা কি জিনিষ সে নিজেও তেমন জানে না। আলোচনা শুনেছে শুধু। আর বয়ঃসন্ধিকাল থেকে বুকের ভেতরে একটু একটু অনুভব করছে যেন। একজন বেশ থাকবে তার সম্পূর্ণ একলার এবং অবশ্যই সে হবে পুরুষ। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা শুনে মনের মধ্যে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। তবে বোধহয় নারীর হৃদয় ওই বহুদূরে মরুভূমির বুকে দণ্ডায়মান নিঃসঙ্গ পিরামিডের মত যার ত্রিভুজাকৃতি হৃদয় থেকে অটেনের তপ্ত কিরণ বিচ্ছুরিত হয় শুধু। হৃদয়ে প্রবেশের পথ পায় না কখনো। যেটুকু উত্তাপ প্রবেশ করার জন্য ছটপট করে, প্রবেশের পথ না না পেয়ে উপরের স্তরে আটকে যায়। তলদেশে পেঁছবার পথ খোঁজার আগেই সূর্যাস্তের ফলে শীতল হয়ে যায়।

সে বলে—তবে যে দেখলাম সেদিন, তুই ওকে দেখে এগিয়ে গেলি ওই খেজুর বনের দিকে। আড়ালে গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলি। তারপর ও তোকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল বাহু দিয়ে, পা দিয়ে, মুখ দিয়ে—সমস্ত দেহ দিয়ে।

মার্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ছোট বোনের চোখের দিকে চেয়ে বলে—তুই দেখেছিস ?

- হ্যাঁ। আমি যে মাঝে মাঝে পালিয়ে ওদিকে যাই। যখন বুকটা ভারী হয়ে থাকে, যখন একা একা ভালো লাগে না তখন চলে যাই সবার অলক্ষ্যে। ওইভাবে তোদের দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন। মনে হলো, তোরা পৃথিবীকে ভুলে গিয়েছিস। তারপর স্নেনখকরে তোর হাত ধরে টানতে টানতে একটা বিরাট পাথরের আড়ালে চলে গেল। তোর মুখ দেখে মনে হল, খুব আনন্দ হয়েছিল। তুই ওর সঙ্গে চলে গেলি। বাধা দেবার চেষ্টাও করলি না। ওটা কি ভালবাসা নয় ?

না না। ওটা অন্য জিনিষ। তবে সেদিন যে প্রত্যাশায় গিয়েছিলাম তাও পূরণ হয় নি। তুই আগাগোড়া ভুল করছিস। অটেনের কৃপায় তোর ভুল ভাঙবে। ভালবাসা অন্য জিনিষ। তার স্বাদ আলাদা। তুই বুঝবি না। ভাল না বেসেও ফ্যারও অনেক নারীর সংস্পর্শে আসেন। আবার ফ্যারও কে ভাল না বেসেও তাঁর রাণী হওয়া যায়। কোন বাধা নেই।

অনখেসেন এবাবে মার্তকে প্রশ্ন করে—ওটা যদি ভালবাসা না হয়, তাহলে ভালবাসা কি ? তুই যখন বলছিস ওটা ভালবাসা নয় তখন কোন্‌টা ভালবাসা তাও নিশ্চয় জানিস।

মার্ত অটেন এবারে একটু অসহায় বোধ করে। তারপর ছোট বোনের চোখের নিষ্পলক দৃষ্টির দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলে—ফ্যারওর প্রধান পুরোহিত, তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা অয় এর বাড়িতে গিয়েছিস কখনো ?

- কতবার। অয় আমাকে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন।

—আমি মাত্র একবার গিয়েছি। আমি যে বড়। সেই সময় একজনকে দেখেছিলাম সেখানে।

—কাকে ?

- অয়-এর ছোট ভাই এর ছেলেকে।

—তাকে কি হয়েছে ?

—সেও আমাকে দেখেছে।

—বেশ তো। এমন কত লোককেই তো কত লোক দেখে।

—হ্যাঁ, কিন্তু এ দেখা অন্য দেখা। জীবনে বোধহয় একবারই এমন দেখা দেখতে পাওয়া যায়। আমাকে দেখেই সে ভালবেসেছিল। আমিও তাকে।

অনখেসেন ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে—কোথায় সে ?

—জানি না। আরও তিন চার বার সে আমাকে দেখেছে। আমিও তাকে দেখেছি। বুঝতে পারি, কত কষ্ট করে সে আমাকে দেখার সুযোগ করে নিত।

অনখেসেন একটু সঙ্কুচিত ভাবে প্রশ্ন করে– সে তোকে স্পর্শ করেছে ?

– হ্যাঁ। নীলনদের পাশে ওই শ্যামল ক্ষেত্রে। ওখানে অনেক গাছপালায় ঘেরা জায়গা পৃথিবীকে যেন পৃথক করে রাখে। পৃথিবীর মলিনতা ওখানে গিয়ে পেঁছোতে পারে না, এত পবিত্র ওই স্থান।

—তুই সেখানে গিয়েছিলি ?

—হ্যাঁ।

—ফ্যারওর কন্যা হয়ে ? একা ?

—হ্যাঁ। একা, সবার অজ্ঞাতে। তার আহবান প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার ছিল না। কোথায় তখন ফ্যারওর কন্যার মর্যাদা ? তার কোন অস্তিত্ব থাকেনা। পৃথিবীতে তখন শুধু একজন পুরুষ, আর আমি তার একমাত্র রমণী। সেইখানে আমি ছুটে গিয়েছিলাম ওর পাশে। ও যে আমায় ডেকেছিল।

রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে থাকে অনখেসেন তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দিকে। এ যেন অজানা অচেনা কোন নারী যে এক ভিন্ন জগতের কথা শোনাচ্ছে।

সে প্রশ্ন করে– তারপর ?

– সে আমাকে স্পর্শ করল। আমি কি করে যেন অনুভব করেছিলাম সে আমাকে স্পর্শ করবে। এটুকুও অনুভব করেছিলাম, এই স্পর্শ টুকুর জন্যে আমি অনাদিকাল অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে সে আমার দেহ মনের মালিক হয়ে গেল। আমি নিশ্চিন্ত হই সবটুকু উৎসর্গ করে।

– তারপর ?

—তারপর আর কি ?

– আর দেখা হয় নি ?

– না।

—কেন ?

– কি করে হবে ? সে যে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হবার আগের দিন অয় আমাকে কঠোর স্বরে বলেছিল– ভুলে যেও না মার্তণ্ড, তুমি দেবমহিষীর

মত। তোমাদের বংশে কিছুদিন আগেও দেবমহিষীর প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন রাজ কন্যাকে নির্দিষ্ট রাখা হত ভবিষ্যতের রাজমহিষীরূপে। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে তিনিই হবেন ফ্যারও। কিন্তু তোমার পিতামহ তৃতীয় অমেনফিস সেই প্রথা ভেঙে দিলেন। তিনি সাধারণ ঘর থেকে নিয়ে এলেন রাজ্ঞী টিকে। তিনিই হলেন প্রধান মহিষী। তবু তোমাকে সবাই দেব মহিষীর মর্যাদা দেয়। এক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হয়ো না একথা। তোমার মনকে রাখতে হবে অটল – পিরামিডের মত। তাই বলছি, যখন তখন যাকে তাকে দেখে উতলা হতে নেই। অন্তত তোমার সেটা সাজে না।

—অয় তোকে হঠাৎ একথা বলল কেন?

—সেদিন আমিও ওর কথার মাথামুণ্ডু বুঝিনি। তবু বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, এ যেন কেন অশুভ সংকেত। সেই সুদর্শন তরুণের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন পরে অয় এর কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছিলাম।

—কি বুঝেছিলি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মার্ত বলে—অয় চায় নি আমি সেই তরুণকে ভালবাসি। তাই সরিয়ে দিয়েছিল তাকে।

—কোথায়? নুবিয়ায়? সিরিয়ায়? নাকি ঈজিয়ান দ্বীপমালায়?

শুষ্ক হেসে মার্ত বলে—না। অতদূর যেতে হবে কেন? মরুভূমিতে তো অগাধ বালুকারাশির অভাব নেই। কত পর্বত কন্দর রয়েছে। আর রয়েছে অসংখ্য সমাধিস্থল—এত পিরামিড। এমনিতেই এটা হ'ল মৃতদের নগরী। আর একটা অতিরিক্ত মৃতদেহের সংখ্যা বাড়লে কারও নজরেই পড়বে না।

—এ যে ভাবা যায় না। অয় এমন কাজ করতে পারল?

—হ্যাঁ। না করে উপায় ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্যারও হলে যে তার অধীনে থাকতে হত। আমার সঙ্গে তার বিবাহ হলে সে হতো ভাবী ফ্যারও। আর সেটা সহ্য করতে পারেনি অয়। মায়ের গর্ভে কোন পুত্র সন্তান নেই। আমরা শুধু ছয় বোন। স্মেনখকরে আবার সাধারণ একজন রাণীর গর্ভের সন্তান। আমি তার স্ত্রী না হলে সেও ফ্যারও হতে পারবে না। মিশরের নিয়মই এই। দেবমহিষী প্রথা উঠি উঠি করেও একেবারে উঠতে পারে না।

—অয় নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছে। নইলে তুই যাকে ভালবাসতিস তাকে ফ্যারও করা যেত।

—সে ফ্যারও না হলেও ক্ষতি ছিল না। আমি শুধু তাকেই চেয়েছিলাম,

আর কিছু নয় পৃথিবীর আর কিছুর ওপর আমার আজও কোন আকর্ষণ জন্মায় নি তেমন। জানিনা পরে কি হবে।

অনখেসেন ভাবে, সে কত কম বোঝে। মার্ত-এর প্রতি সহানুভূতি আর শ্রদ্ধায় তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

কিন্তু এই দুই উদ্ভিন্ন যৌবনা সহোদরার কথা জানতে হলে তাদের দেশ সম্বন্ধে এবং সেই দেশের রাজবংশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান। অর্থাৎ এই ভূখণ্ডের উপর দিয়ে যদি নীলনদ প্রবাহিত না হতো তাহলে সাহারা মরুভূমির দৈর্ঘ্য আরও বিস্তৃত হয়ে আরবের মরুভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নীলনদ তা হতে দিল না। সে বহুদূরে আফ্রিকার প্রায় অভ্যন্তরের হ্রদরাজি থেকে জন্ম নিয়ে সহস্র যোজন পথ ছুটে এল মিশরের পরিত্রাতা রূপে। কতটুকু পথই বা সে মিশরের ভেতর দিয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে? কিন্তু তাতেই মরুভূমি পরিণত হ'ল স্বর্ণভূমিতে। আফ্রিকার ভেতরের দেশগুলো থেকে অফুরন্ত পলিরাশি অবিশ্রান্ত ভাবে বয়ে এনে সে মরুভূমিকে করে তুলল সুজলা সুফলা। তার আগে সে তার গতিপথে ছয়টি প্রপাতের সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে একটি প্রপাত রয়েছে শুধু মিশরের মধ্যে। মিশরের প্রতি নীলনদের পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী। নইলে এখানে এসে সে অনেক ধারায় বিভক্ত হয়ে যেত না। এই ভাবে সে অনেকখানি অঞ্চলকে প্রাকৃতিক সেচের আওতায় এনে দিয়েছে। ফলে এখানেই ঘটে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার উন্মেষ।

নীলনদের গতিপথ সারা বৎসর জলমগ্ন থাকেনা। বৎসরের নির্দিষ্ট কিছু সময় তার দুই ধার কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাই এক অতি প্রাচীন কৃষি নির্ভর সভ্যতা গড়ে ওঠে এখানে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয় না এখানকার কৃষকদের। নির্দিষ্ট সময়ে নদীর বুক জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেইভাবে থাকে বৎসরের অনেক কয়টি মাস। তারপর একসময় পলিমাটি ফেলে রেখে সে অতি সংকীর্ণ হয়ে সাগরের বুকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তার শীর্ণ জলধারায় প্রতিবিম্বিত হয় মাতৃ স্নেহের প্রশ্রয়। সেই প্রশ্রয়-ভরা চাহনি নিয়ে সে উৎসুক

ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে কৃষকদের কর্মব্যস্ততা। তাদের ফসল ফলানোর উদ্যোগ। প্রকৃতি এখানে খেয়ালী নয়। তাই কৃষকেরা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ।

কিন্তু তবু কৃষকেরা তেমন সুখী নয়। কারণ বৎসরের অনেকটা সময় তাদের কর্মহীন অবস্থায় বসে থাকতে হয়। ফলে দারিদ্র্য এসে উঁকি দেয় তাদের পরিবারে। আর তখনি আসে ফ্যারওর ডাক—চলো তোমরা ওই দূরের পাহাড়ে। ওখানে তোমাদের জন্য অফুরন্ত কাজ। নিষ্কর্মা বসে থাকতে হবে না।

কৃষকরা জানে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে সেখানে। পরিবর্তে পাবে যৎসামান্য পারিশ্রমিক। তবু যেতে হয়। নইলে ফ্যারওর কোপ এসে পড়ে। জানে সেখান থেকে গৃহে ফেরার সময় পারিশ্রমিকের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট থাকবে না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অনশনক্লিষ্ট স্ত্রী পুত্র কন্যার চোখের আশার আলো তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে নিভে যায়। তবু যেতে হয়। কর্মহীন অবস্থায় ঘরে বসে থেকে চোখের সামনে অর্ধাসনে ক্ষুধার্ত প্রিয়জনের কাতর চাহনি নিজের চোখে দেখতে হয় না। তাই যেতে হয় ফ্যারওর ডাকে। কারণ উপার্জনের হাত ছানি রয়েছে তাতে।

তারা যায়। দূর পাহাড় থেকে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড তারা বয়ে আনে তাদের বর্তমান আব ভবিষ্যতের ফ্যারওদের সমাধিস্থল নির্মাণের উপাদান রূপে। এই ত্রিভুজাকৃতি সমাধি মন্দিরের প্রথম সৃষ্টি হয় নাকি বহু বছর আগে ফ্যারও জোসেবের রাজত্বকালে। তাঁরই রাজত্বকালে ইমহোটেপ নামে এমন একজন ছিলেন যাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। সেই শুরু। তারপর থেকে প্রতি ফ্যারওর রাজত্বকালে এটি প্রায় নিয়মে পর্যবসিত হল। প্রত্যেকেই নিজের সামর্থ অনুযায়ী ছোট হোক বড় হোক মৃত্যুর পরে বসবাসের জন্য সুখপ্রদ আগাম একটি বাসস্থান নির্মাণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেটি নির্মাণে ব্যর্থ হলে প্রজাবৃন্দের কাছে বুঝি মর্যাদা রাখা দায় হয়ে ওঠে। তাই নদী যখন থাকে জলে টৈটম্বুর, কৃষকগণ থাকে কর্মহীন, তখন তাদের আজও, এই অখেন-অটেনের রাজত্বেও পাঠানো হয় সেই দূরের পর্বতমালায় যেখানে সারা বছর ধরে অসংখ্য শ্রমিক পাথর কেটে চলেছে অবিরাম গতিতে। কারণ পিরামিড নির্মাণের আকাঙ্খার নিবৃত্তি নেই। কত অশান্তি গেল, উত্তর আর দক্ষিণের মিশরবাসীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হলো, কতবার ফ্যারওর সেনাপতিরা সিনাই-এর দিকে অভিযান চালালেন, তবু সুদূরে পর্বতগাত্রে ছেনি আর হাতুড়ির শব্দের বিরাম হলো না। সেখানে লৌহের সঙ্গে প্রস্তরের প্রচণ্ড সংঘর্ষে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে আজও এই অখেন-অটেনের রাজত্বেও।

এই অখেন-অটেনের পূর্বপুরুষের প্রায় দুশো বছর ধরে মিশরে রাজত্ব করে এসেছেন। অখেন-অটেন এঁদের বংশের নবম পুরুষ। এঁরা অনেক যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেক ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। দেশে সোনার অভাব নেই নুবিয়ার স্বর্ণখনির দৌলতে। কিন্তু রৌপ্যের ছিল একান্ত প্রাদুর্ভাব। এই দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহের জন্য যেতে হ'ল ঈজিয়ান অঞ্চলে। তাছাড়া সিরিয়ার তৈরী অতি সুদৃশ্য সুরা ইত্যাদি রাখার পাত্র নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কৃষকদের দুঃখ কাটে না। চিরস্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে তাদের দুর্দশা। কারণ অধিকাংশ জমির মালিক হলেন ফ্যারও এবং মুষ্টিমেয় উচ্চ পরিবার। যারা প্রকৃত ফসল ফলায়, জমি কর্ষণ করে তারা মজুর হয়ে সেসব করে। অনেকে জমি বর্গা নেয়। চাষের জন্য অনেক শস্য তুলে দিতে হয় জমির মালিককে।

এই সব অবিচার আর অত্যাচারের জন্য দেশের অধিবাসীদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ বিরাজ করে। তবু তারা তাদের নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী গোপনে পূজা করে তাদের আরাধ্য দেবতা আমেনকে। অখেন-অটেন সেই স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে চান।

নেফেরতিতির সঙ্গে ফ্যারওর মনোমালিন্য এতটাই বৃদ্ধি পায় যে সেটা পাঁচ-কান হতে হতে নগর বাসীদের মধ্যেও জানাজানি হয়ে যায়। নেফেরতিতি আমেন দেবতাকে যতই আকড়ে ধরতে চান ততই বাধা আসে স্বামীর তরফ থেকে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অনখেসেনের বুক ফেটে যায়। মায়ের মধ্যে একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে যেন। যতই ব্যক্তিত্ব সম্পন্না হোন না কেন দেশের শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করা বড় কঠিন। তার প্রভাব মনের সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর পড়বেই। মায়ের অনিন্দ্যসুন্দর রূপেও মনে হয় এখন ভাটার টান। একদিন সে নিরিবিলিতে পেয়ে মায়ের হাত দুটো চেপে ধরে।

—কি হ'ল? হাত ধরলে যে বড়।

—আমাকে তুমি মা এখনো কি ছোট ভাব?

—না। তা ভাবব কেন? মায়েরা ঠিক জানে মেয়ে কবে বড় হল। তুই দুই বছর আগে বড় হয়েছিলি। মনে নেই শুকনো মুখে চোখ বড় বড় করে আমার কাছে ছুটে এসেছিলি?

অনখেসেনের মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—তুমি আমার কথা এড়িয়ে যেতে চাও। তোমার জন্যে আমার বড় দুশ্চিন্তা হয়।

—কেন ?

—তুমি জাননা ? চেপে রাখার চেষ্টা করলেই চাপা থাকে ?

মা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। সেই সময় তুতনখটেন সেখানে এসে মায়ের পাশে দাড়ায়। ডাগর ডাগর চোখ তুলে ও একটু হাসে। অনখেসেনের চেয়ে সে সামান্য ছোটই হবে। তবে ওকে অনখেসেনের ভাল লাগে। ওর চোখের দৃষ্টিতে মায়া মাখানো। অমন দৃষ্টি ফ্যারওর প্রাসাদে কারও নেই। ও একটা ব্যতিক্রম।

মা তুতনখকে নিয়ে চলে যেতে চান। অনখেসেন বাধা দিয়ে বলে—দাড়াও।

এবারে মা ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে ভালভাবে তাকান। জানিনা কি দেখলেন তিনি কন্যার চোখের মধ্যে। বললেন—চাপা যখন নেই তখন প্রশ্ন করে আমাকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া কেন ?

তুতনখ-এর সামনে অনখেসেন কেঁদে ফেলে। বলে—আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না জানি। ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে কখনো বদলানো যায় না। যদি যেত, বলতাম আগের মত অটেনের আরাধনা শুরু কর। কিন্তু তা যে হবার নয়। তাই আমার বড়ই আশঙ্কা। মার্তের মুখে সেদিন একটা ঘটনার কথা শুনে তোমার জন্যে বড় ভয় হয় মা।

—মার্তে কি বলেছে ?

অনখেসেন একবার তুতনখ-এর মুখের দিকে চায়। সে ছোট হলেও মার্তের ভালবাসার কাহিনী না বোঝার মত নির্বোধ বোধহয় নয়। তবে সে পুরুষ। পুরুষদের এই বয়সে নাকি প্রেমের কথা বোঝার বুদ্ধি হয় না। কিন্তু তুতনখকে দেখলে মনে হয় অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। তাই তাকে নম্র কণ্ঠে অনখেসেন বলে —তুমি একটু ওদিকে যাবে তুতন। মাকে দুটো কথা বলব।

তুতনখ বাধ্য ছেলের মত ঘাড় হেলিয়ে দূরে সরে যায়। অনখেসেন তখন ধীরে ধীরে মার্তের সেই অপূর্ব প্রেমের কাহিনী শোনালো পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাণীরূপে এ পর্যন্ত যা সে শুধু একাই জানত।

অনখেসেনের মুখে জ্যেষ্ঠা কন্যার বেদনার কাহিনী শুনে নেফেরতিতি স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন অনখেসেন শুধু কৈশোর অতিক্রম করেছে তাই নয় সে এখন পরিপূর্ণ নারী। মরু দেশের তপ্ত জলহাওয়া বোধহয় এই নারীত্বকে তাড়াতাড়ি এনে দেয়।

অনখেসেনে দেখে, মায়ের চেখে জল টলটল কাছে। কন্যার ব্যাথায় ব্যথী তিনি

হতে পারেন নি। হতে চাননি কখনো। তাই বোধহয় দগ্ধ হৃদয়ের অনুতাপ বিগলিত হয়ে অমন অশ্রুর রূপ ধরে চিক্‌চিক্‌ করছে।

মা বলেন—আমার ভাগ্যে তেমন যদি কিছু থাকে কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তার জন্যে তোর উতলা হতে হবে না।

—এ তুমি কি বলছ মা?

—তুই কি সত্যি আমাকে ভালবাসিস?

—ভালবাসব না?

—কেন? আমি তো কখনো মায়ের কর্তব্য করিনি।

—তা জানি না। মার্তে বোধহয় ভালবাসেনা। তোমার মেজ মেয়ের কথা আলাদা। বেচারা শুধু রোগে ভোগে। সে অন্যের কথা ভাবার সময় পায় না।

—হ্যাঁ, মক্‌ত-অটেন বড় দুর্বল। মনে হয় বেশীদিন বাঁচবে না। ও তোর চেয়ে এক বছরের বড়, অথচ ওকে মেয়ে বলে মনেই হয়না। বুক দুটো ঠিক ছেলেদের মত রয়েছে এখনো।

একটু দূরে তুতন্‌খ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বাইরে আকাশের দিকে। ওর চোখে মুখে সূর্যাস্তের রক্তিমাভার খেলা। দেখতে খুব ভাল লাগছে। ঠিক যেন দেবপুত্র। ওকে বড় বেশী নিষ্পাপ বলে মনে হয় অনখেসেনের কাছে। মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় একটু উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সে লক্ষ্য করেছে কিছুদিন থেকে তার মা তুতন্‌খকে নিজের কাছাকাছি রাখছেন। স্বামী কর্তৃক অবহেলিত হয়ে তুতন্‌খ যেন তার শেষ আশ্রয়স্থল। অথচ তুতনেখর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক নেই। বরং বলা যেতে পারে তুতন তাঁর স্বামীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তৃতীয় অমেনফিসের অতি বৃদ্ধ বয়সের ফসল। সে যখন পৃথিবীর আলো দেখল তখন বর্তমান ফ্যারও অখেন অটেন পিতার সঙ্গে সহ-শাসক রূপে প্রায় সাত বছর অধিষ্ঠিত। সেই সময়ে সম্রাজ্ঞী টি'র গর্ভে এলো এই সন্তান। টি নিজেই তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নিদারুণ এক লজ্জা। কারণ তখন তাঁর পুত্রবধূ নেফেরতিতি তৃতীয়া কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে ফেলেছেন।

টি'র মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্না রমণী স্বামীর অমেনফিসের কাছে কেঁদে বলেছিলেন—এ বড় লজ্জা। আমাকে উদ্ধার কর।

—কি ভাবে? শিশু হত্যা করে?

—না না। ছি?

—তবে?

—আমাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা সিতামানের গর্ভজাত বলে ঘোষণা কর এই

সন্তান। অমেনফিসের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে রাণীর এই কথায়। তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বলেন—তোমার গর্ভে আর পুত্র সন্তান হচ্ছে না দেখে তোমারই পরামর্শে নিজের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও সিতামানকে বিবাহ করি। কিন্তু তার পরেই তোমার পুত্র সন্তান হল। শুধু শুধু সিতামানকে বিবাহ করলাম। জানি, এমন কিছু অনুচিত কাজ করিনি। তবু দেশের মানুষের মধ্যে সাড়া জেগেছিল। সিতামান এখন অমেনের পূজারিণী হয়ে ভালই আছে। তার কত সম্মান। এর মধ্যে আমি তাকে নতুন করে জড়াতে চাই না।

রাণী টি আর কিছু বলতে সাহস পাননি। শিশু সন্তানকে এক দুগ্ধবতী ধাত্রীর হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। এই বয়সে আর ভাল লাগে না।

তবু নেফেরতিতি এসে খুব হেসেছিলেন টি-এর সামনে দাঁড়িয়ে। অথচ এর আগে তাঁর সামনে মাথা তুলতে পারতেন না। কারণ টি-এর ব্যক্তিত্ব আরও প্রখর আরও গভীর। তাই এতদিন পরে টি কে অপদস্থ করার প্রলোভন ছাড়তে চাননি তিনি। কিন্তু তাঁর সামনে এসে যখন দাঁড়ালেন টি তাঁর সমস্ত লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আত্মস্থ।

নেফেরতিতির হাসি শুনে তিনি বিস্মিত হবার ভান করে বলেন—হাসছ কেন? এধরণের কুৎসিত হাসি ফ্যারও পরিবারে মানায় না।

না। এমনি দেখতে এলাম আমার নতুন দেবরকে।

—দেখো, ভাল করে দেখে নাও। তোমার স্বামী সহ-শাসক হলেও তার মতি খুব অস্থির। তাই এই পুত্রকে জন্ম দিয়ে আমি ভবিষ্যত বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ওর জন্যে আমি গর্বিত। পুত্রের জন্ম দেওয়া কম সৌভাগ্যের নয়। তুমিও দেবতার কাছে প্রার্থনা কর আমার মত যেন পুত্রের জননী হতে পার। তোমার তিনটি সন্তানই কন্যা। জানিনা পরে আরও হবে কিনা। হলেও পুত্রের মা হতে পারবে কিনা কে জানে।

নেফেরতিতির পুত্রের মা হবার সৌভাগ্য সত্যিই হয়নি। ছয়টি কন্যা সন্তানের জননী তিনি। ফ্যারও অখেন-অটেন যতদিন স্ত্রীর রূপে মোহগ্রস্থ ছিলেন ততদিন কিছু বলেন নি। কিন্তু পরে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে শুরু করেছিলেন। আর এখন তো প্রধান মহিষীকে সহ্যই করতে পারেন না।

টি-এর সঙ্গে মায়ের এই কথোপকথনের কথা মার্ত ও অনখেসেন শুনেছিল এক ক্রীতদাসীর মুখে। তাই কিছুদিন ধরে তুতনখকে মায়ের কাছাকাছি দেখে ও অবাক হয়েছিল। বলতে গেলে টি তাঁর সদ্যজাত শিশু-পুত্রকে অস্থিরমতি অখেন-অটেনের বিকল্প বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন।

তবু সেই তুতেনখকে কাছে টেনে নেওয়া নেফেরতিতির পক্ষে অস্বাভাবিক বৈকি। অনখেনসেন অটেন ভাবে, তুতনকে নিশ্চয় ফ্যারওর রোষ থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছেন মা। হয়ত কোনো আভাস পেয়েছেন তুতনখ-এর জীবন সংশয়ের। কত হত্যাই তো ঘটে চলে লোক চক্ষুর অন্তরালে এই সিংহাসনের জন্যে। মা হয়ত ভেবেছেন পিতা তাঁর প্রিয় পুত্র স্মেনখকরের সিংহাসন প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য তুতনকে সরিয়ে দিতে চান চিরতরে। পিতার প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যই হয়ত মা তার পক্ষ নিয়েছেন। শত হলেও তার ধমনীতেও রাজরক্ত প্রবাহিত। স্মেনখকরেকে পছন্দ করেন না মা। তার একটি বিশেষ দোষ রয়েছে। মার্ত একদিন কথায় কথায় বলেছিল সেকথা। সে ঠিক বুঝতে পারেনি। স্মেনখকরের নাকি নারীদের চেয়ে পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ বেশী। কথাটা বলে মার্ত খুব হেসেছিল। তারপর বলেছিল, তাতে এসে যায় না। এরপর মার্ত জলের মত সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। আসলে সে যে রাণী হবে তাতেই আনন্দ। স্মেনখকরের দেহের উত্তাপের জন্য সে বিন্দুমাত্র লালায়িত নয়।

মায়ের সঙ্গে অনখেসেনের কথা যখন শেষ হল তখনো তুতন আকাশের দিকে তাকিয়ে। তবে সূর্যের শেষ রশ্মি তার মুখের ওপর ততটা আর রক্তিম নয়।

তুতনখকে ডাকে অনখেসেন। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। নিজের মায়ের কথা তার মনে নেই। বাবার কথাও নয়। তবু সে বেড়ে উঠেছে পরিচারিকাদের তত্ত্বাবধানে। স্নেহ কাকে বলে সে জানেনা বোধহয়। নেফেরতিতি তাকে একটু স্নেহ করেন, তাতেই সে বিগলিত। অনখেসেনের কষ্ট হয় তুতনের জন্য। যদি পারত তাহলে তুতনখকে সে বিয়ে করত। অমন সুন্দর মানুষ হয় না। তাকে দেখতে সুন্দর, মনটিও সুন্দর।

তুতনখ কাছে এসে দাঁড়ালে অনখেসেনের ইচ্ছা হয় তার গায়ে হাত দিতে। মায়ের সামনেই একটা ছুতো করে বলে—তোমার মুখে ওটা কি লেগে রয়েছে? দেখি।

নেফেরতিতি বলে ওঠেন—কোথায়? কিছু তো নেই।

অনখেসেন ততক্ষণে তার মাথা এক হাত দিয়ে সামান্য নীচের দিকে নামিয়ে আর এক হাত দিয়ে গালের ত্বক স্পর্শ করে বলে—এবারে ঠিক আছে।

নেফেরতিতি একটু হাসেন?

—হাসলে যে?

—না, চিররোগী মকত-অটেনের মত তোর বুক তো মসৃন নয়। বুকের ভেতরে অনেক ভালবাসা সঞ্চিত রয়েছে—অনেক স্বপ্ন।

অনখেসেন অপ্রস্তুত হয়ে বলে—কি যে বল মা।

—কিছু না। চল তুতেন।

অনখেসেন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চলে যেতে দেখে। আবার নিঃসঙ্গতা। আসলে তাঁরা ছয় বোন হলেও সবাই নিজের মত থাকে। সে চায় সবাইকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করতে। কিন্তু তারা অন্যরকম। তাই একটা কিছু নূতনত্ব চাই।

সেই নূতনত্বের আস্বাদন অনখেসেন পেল কিছুদিনের মধ্যেই। ফ্যারও অখেন-অটেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁর পিতা যেমন তাঁকে সহ-শাসক রূপে অধিষ্ঠিত করেছিলেন তেমনি তিনিও স্মেনখকরেকে সঙ্গে নেবেন শাসক হিসাবে। কিন্তু তার আগে তার বিবাহ দেবেন মার্ত-অটেনের সঙ্গে পূর্বসিদ্ধান্ত মত।

স্মেনখকরে নেফেরতিতির গর্ভজাত পুত্র নয়। সুতরাং তার প্রতি বিন্দুমাত্র স্নেহও নেই ববং রয়েছে কিছুটা বিরক্তি। কারণ স্মেনখকরে ফ্যারওর ঔরসজাত পুত্র হলেও তার গর্ভধারিণী ছিল সিরিয়ার ওদিক থেকে নিয়ে আসা এক সুন্দরী। বলতে গেলে ক্রীতদাসী। তাতেও কিছু অসুবিধা ছিলনা। কারণ ফ্যারও পরিবারে এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু একটা কৌতুহলোদ্দীপক গুজব শোনা যায় স্মেনখকরের জন্মেতিহাস নিয়ে। তার সুন্দরী গর্ভধারিণীর নিকট অখেন-অটেনের মত নাকি তার পিতা অমেনোফিসও উপগত হতেন। এই গুজবের মধ্যে কতটা সত্য নিহিত রয়েছে এতদিন পরে সঠিক ভাবে বলা যায় না। তবু এখনো গুজবটা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি। তাই মার্ত-অটেন বিয়ের রাতে অনখেসেনের গায়ে ছোট্ট একটা চিমটি কেটে বলেছিল—কে জানে, কাকে বিয়ে করছি। ভাই, না কাকা?

মার্তের রসিকতায় অনখেসেনেরও হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আর সেই হাসি দেখে ফেলেছিলেন স্বয়ং ফ্যারও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে কাছে ডেকে ছিলেন।

—হাসলে যে?

—আমি? না তো।

প্রচণ্ড ধমক দিয়েছিলেন ফ্যারও—আমি নিজের চোখে দেখেছি।

পিতার ক্রোধ, তাঁর খামখেয়ালীপনা, কোন কিছু জানতেই আর বাকি নেই তার। তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেলেছিল—মার্ত হাসছিল তাই।

—মার্ত হাসছিল কেন ?

—খুব আনন্দ হয়েছে। বলছিল, কদিন পরে সম্রাজ্ঞী না হলেও একটু একটু রাণী তো হবে।

—একটু একটু কেন ? একেবারে সম্রাজ্ঞী হবে।

না না, রাণী নেফেরতিতি থাকতে—

-হ্যাঁ, তিনি থাকতেই মার্তকে প্রধানা মহিষী বলে ঘোষণা করা হবে। নেফেরতিতির কন্যা হলেও সে অটেনের সেবা করে। এতদিন যিনি রাণী ছিলেন তিনি আর অটেনের সেবিকা নন।

অনখেসেন বুঝতে পারে পিতা তার হাসির কথা ভুলে গিয়েছেন। সে বলে মার্তকে বলব একথা ?

—কোন কথা ?

-আজ থেকেই সে প্রধানা মহিষী।

ফ্যারও খিঁচিয়ে ওঠেন—অত তাড়াতাড়ি হয় নাকি ? সব কিছুর একটা নিয়ম আছে। যাও এখান থেকে।

অনখেসেন পালিয়ে বাঁচে।

স্মেনখকরে সহ-শাসক রূপে ফ্যারওর কাজের অংশীদার হবার কিছুদিন পর থেকেই কর্মচারীদের মধ্যে তার সম্বন্ধে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ল। তার মধ্যে ফ্যারও সুলভ গাম্ভীর্যের অভাব পরিলক্ষিত হ'ল। অনেক সময় এমন সব কাজ সে করতে লাগল যা তার পিতার খামখেয়ালীপনাকেও ছাড়িয়ে যেতে থাকে। এতে মার্ত-অটেন উৎকণ্ঠিত হয়। কারণ এতে তার রাণীর আসনে অধিষ্ঠিত থাকার স্থায়ীত্বে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। ফ্যারওর প্রাসাদে সবই সম্ভব। মার্ত-এর প্রেমিকের মত কত প্রেমিক প্রেমিকা কত রাজপুত্র আর রাজকন্যা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ফ্যারও পদে আসীন থাকতে হলে ক্ষমতা সম্পন্ন রাজ কর্মচারীদের সঙ্গে অত্যন্ত কৌশলে ব্যবহার করতে হয়। সুযোগ বুঝে কাউকে কাউকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হয়, কারও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দিতে হয়।

সবকিছুই ফ্যারও করেন তাঁর সিংহাসন আর জীবনের নিরাপত্তার জন্য। কূট কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে টিকে থাকা যায় না। অয়কে অনখেসেনের অতটা বিপজ্জনক বলে মনে হয় না। কিন্তু এখন যিনি নতুন সেনাপতি হয়েছেন সেই হোরেমহেবকে দূর থেকে দেখলে ভাল মনে হয় না। এটা হয়ত তার মা নেফেরতিতির এক মন্তব্যের জন্য। তার পিতামহী টি-এর মত তার মায়ের জন্মও হয়েছে সেনাপরিবারে। তিনি অনেক খোঁজ খবর রাখেন। তিনি একদিন তাকে ডেকে হোরেমহেবকে দেখিয়ে বলেছিলেন—লোকটাকে দেখে রাখ। এদের পরিবার অত্যন্ত শিক্ষিত। এদের মধ্যে অনেক গুণ রয়েছে যা মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এদের কোন নীতিবোধের বালাই নেই। এরা বড় নিষ্ঠুর। উচ্চাশা পূর্ণ করতে এরা পারেনা এমন কোন কাজ নেই।

অনখেসেন মাকে বলেছিল—আমাকে বলে কি হবে? তোমার বড় মেয়েকে বল। তারই তো রাণী হবার কথা।

—হ্যাঁ। কিন্তু তাকে তো রাণী বলে ঘোষণা করা হলো না এখনো।

—ফ্যারওর নিজের একটা সম্মান আছে। তুমি এখনো সশরীরে রাজধানীতে রয়েছ। পুত্রবধূকে রাণী বলে ঘোষণা করলে লোকে হাসবে।

প্রশংসার দৃষ্টিতে তৃতীয়া কন্যার দিকে চেয়ে মা বলেছিলেন—এরই মধ্যে রাজনীতি বুঝতে শিখেছিস দেখছি।

—তোমার মেয়ে তো। কিন্তু হোরেমহেব খারাপ হলে আমার কি এসে যায়?

—না। তোর কিছু এসে যায় না। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আমি এখানে না থাকি তখন মার্ত কিংবা ফ্যারওকে সাবধান করে দিতে পারবি।

—হোরেমহেব কিছু না করলে সাবধান করে দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

—ওরা কখনো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে না।

—আর অয়?

—অয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অত্যন্ত প্রতিভাবান। তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ রয়েছে কিছুটা। কোন নৃশংস কাজ করতে দু'বার ভাববে সে। হোরেমহেবের মত বেপরোয়া হবেন না।

—সেই নৃশংস কাজটা কি?

এবারে মা একটু জোরে বলে ওঠেন—হত্যা। ফ্যারওকে হত্যা। দরকার হলে ফ্যারওর পদ লাভের উদ্দেশ্যে যতগুলো প্রয়োজন হত্যা করা।

—কি বলছ তুমি মা?

—ঠিকই বলছি।

সেই সময় তুতন্‌খ ঘুমভাঙা চোখে এসে দাঁড়ায় মায়ের পাশে। মা নীরব হয়ে যান। তুতনখ যেন রক্তমাংস দিয়ে গড়া সাক্ষাৎ সরলতা।

মা সহসা বলে ওঠেন – আজ আমার যদি কিছু হয় এই ছেলেটার দায়িত্ব নিতে পারবি ?

অনখেসেন চমকে ওঠে। তুতেন্‌খও। সে মায়ের দিকে চেয়ে বলে—তোমার কিছু হবে না। আমি হতে দেবো না।

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন—এমনিতে বলছি। তোর তো আপন বলতে আর কেউ নেই।

প্রায় সমবয়সী অনখেসেনের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে তুতন্‌খ বলে—তোমার কিছু না হলেও ও আমাকে দেখবে। আমি জানি।

মায়ের অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অনখেসেন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। কেন এই লজ্জা বুঝতে পারে না। শুধু তুতেন্‌খ-এর ওপর রাগ হয় খুব। ছেলেটার বুদ্ধি হয় নি এখনো। আর কয়েক বছর না গেলে হবেও না।

—কি রে। তুই ওকে দেখিস নাকি ?

—তুমি ওকে অত ভালবাস। তাই নজর রাখি।

—খুব ভাল। পারলে ওকে ভালবাসিস।

—ও আমার ভাই নয়।

—ভাই-এর মত না হয় না বাসলি।

অনখেসেন হেসে বলে—তবে ? কাকার মত ?

তুতেন্‌খও ওর কথার ধরণে আনন্দিত হয়।

মা বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন,—না। অন্যরকম। মার্ত-এর কাহিনী শুনিয়েছিলি ? সেই রকম।

—তুমি পাগল হয়েছ মা ? এ তো আমার চেয়েও ছোট।

—ছোটও একসময়ে বড় হয়। একবার এর দিকে চেয়ে দেখ তো। ক'দিন পরে কেমন দেখতে হবে কল্পনা কর। বুঝতে পারিস ?

অনখেসেন মাথা নীচু করে বলে—পারি।

তুতেন্‌খ বলে ওঠে—আমারও দাড়ি গোঁফ হবে। আমি যুদ্ধে যাব, শিকারে যাব। সিনাই দেশে গিয়ে নীলকান্ত মনি নিয়ে আসব।

অবুঝের মত বললেও তুতেন্‌খের কথায় খুব আনন্দ পায় অনখেসেন। প্রশ্ন করে—কার জন্যে আনবে ওই মনি ?

মায়ের গায়ে হাত রেখে বলে—এর জন্যে।

—আর আমি ?

—বা বে, তোমাব জন্যে তো আনবই।

ভবিষ্যৎ কল্পনায অনখেসেনের সর্বশবীব অবশ হযে ওঠে। মা আজ এক স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন। কিন্তু কেন ? আজ যদি ফ্যাবও কোন উচ্চ পদস্থ কর্মচাবীর সঙ্গে তাব বিবাহ ঠিক কবেন তবে কি মা বাধা দিতে পারবেন ? হোবেন-হেবেব কথাই ধবা যাক। সেও তরুণ। সে নতুন সেনাধ্যক্ষ হয়েছে, নিশ্চয় তার যোগ্যতাব বলে। তাব সঙ্গে যদি ফ্যাবও বিযে দিতে চান তবে কি সে অমানুষ বলে মা এই বিবাহ ভেঙে দিতে পাববেন ?

তুতন চলে যায। মাঝে মাঝে নেফেবতিতিকে স্পর্শ কবে না গেলে সে বোধহয নিশ্চিন্ত হতে পাবে না। কিছুক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আবার চলে যায় নিজের খেয়ালে।

অনখেসেন বলে—তোমাব কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার ভাগ্যকে যেন ছকে বেঁধে দিতে চাও। তুতনখকে ভালবাসা খুব সহজ। কিন্তু তারপর ?

—তাবপর ওকে বিয়ে করবি।

—পাবব ? ফ্যারও এখন তোমার কথায় চলেন না। তাঁকে পরামর্শ দেবার অনেক লোক আছে।

—জানি। কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে যদি তোর বিয়ে না হয় তার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা কবব।

—কেন ?

—বুঝতে পারলি না ? তোকে যে বিয়ে করবে সে হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

—কেন স্মেনখকরে রয়েছে।

—কিন্তু তারপর ?

—সেকথা এখন ভেবে কি হবে ?

—না এখনি ভাবতে হবে।

—মার্তে-এর পুত্র হতে পারে।

—মনে হয় ওর কোন সন্তানই হবে না। বুঝতে পারিস না ? মার্তের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা তোর, ওর মুখেব দিকে চেয়ে দেখিস না কখনো ! ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথাও তো হওয়া উচিত। অয়-এর ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা তোকে বলতে পারে আর এখন তার বিবাহিত জীবনের কথা বলে না ?

—জিজ্ঞাসা করিনি। ইচ্ছা করে না।

—আমার আর একটা ভয়ও আছে। হয়ত মার্ত রাণী নাও হতে পারে। হলেও বেশীদিন না ও থাকতে পারে।

—কেন ?

—এখন বলব না। সময় হয় নি। কিন্তু আমার আশঙ্কা তাই।

—এতটা বললে আর এটুকু বলবে না ?

—না। হয়ত চারদিকের চাপে আমার মস্তিষ্কও ফ্যারওর মত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই আজে বাজে চিন্তা করছি। ফ্যারওর অসুস্থতার কথা একটু একটু করে সবাই জানতে পারছে। কতদিন আর আড়াল করে রাখব। এখন তো তিনি আমাকে কাছে ঘেঁষতে দেন না। আরও দূরে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে এ কথাও জানি। হোরেমহেব হয়ত মদত দিচ্ছে। তাঁর রাজনীতির মধ্যেও অপ্রকৃতিস্থতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এখন। তাই আজ কৃষকেরা অভুক্ত। ওয়াদীর নিরালা স্থলে ফ্যারও তাঁর মৃতদেহের শেষ আশ্রয়স্থল নির্মাণ শুরু করলেও, কৃষকেরা পারিশ্রমিক আদৌ পায় কিনা সন্দেহ আছে। একটার পর একটা অমেনের মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছে। সবাই ক্ষিপ্ত। জানিনা শেষ পর্যন্ত কি হবে।

কন্যার কথা ভুলে গিয়েছিলেন নেফেরতিতি। আপন মনে বকছিলেন। বলেন —দেখলি তো, আমিও অপ্রকৃতিস্থ।

—না। তুমি শুধু দুর্ভাবনাগ্রস্থ।

—তুতনখকে আমি ভবিষ্যতের ফ্যারও রূপে কল্পনা করি। তোর সঙ্গে বিয়ে হলে সেটা অনেক সহজ হবে।

—তুমি তুতনের প্রতি আমাকে প্রলুব্ধ হতে প্ররোচিত করছ। কিংবা আমার প্রতি তুতনখকে। এটা কি ভাল ?

—না। কিন্তু, আমি চাই না আমার কন্যার স্বামী ছাড়া অন্য কেউ মিশরের সিংহাসনে বসুক।

—তুতনখ কি বলে ?

—তাকে এখনো বলিনি। কিন্তু সে আমার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। তার মতামত জানার প্রয়োজন নেই। সেই বয়সও তার হয় নি। তুই মেয়ে—দেহে ও মনে অনেক বেশী পরিণত। তাই তোর প্রস্তুতির জন্য একথা বললাম।

অনখেসেন একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ স্বরে বলে—এমন কিছু ঘটলে মার্তের যে কী দুর্গতি হবে! ভাবলে কষ্ট হয়।

—তেমন না হওয়াই ভাল। তবে মার্ত কখনো জননী হতে পারবে বলে মনে হয় না। স্মেনখকরের প্রতি অমেনের কৃপা হলে অবশ্য অন্য কথা।

—ফ্যারওর নিবাসে দাঁড়িয়ে এই নাম উচ্চারণ করলে।

—এ নাম আমার হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে।

—তুমি মরবে মা।

—জানি।

নুবিয়ার সোনার খনিতে কিসের যেন গণ্ডগোল হয়েছে। শ্রমিকরা কাজ করতে চাইছে না। তারা অর্ধভুক্ত, বহুদিন নিয়মিত পারিশ্রমিক পাচ্ছে না। তাদের অনেকে দলবেঁধে চলে গিয়েছে নীলনদের তীরে। সেখানে তারা চাষ বাস করবে।

ফ্যারও অখেন অটেন খবর শুনে জ্বলে উঠলেন। বুঝলেন এ হলো অটেনের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে নেফেরতিতির ঔদ্ধত্য আর অবিশ্বাসের জন্য। তিনি বহুদিন পরে নেফেরতিতির ঘরে আসেন। তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে রাণী সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠেন।

—ফ্যারও, আপনি!

– হ্যাঁ। তাই বলে ভেবোনা তোমার রূপসুধা পান করতে এসেছি।

– জানি। সেই রূপ নেই, সুধা আর কি করে থাকবে।

–থাকলেও আসতাম না একজন হীনমনা নাস্তিকের কাছে। অটেন ক্ষমা করতেন না।

—তোমার ভয় কিসের? তুমি সাক্ষাৎ অটেনের পুত্র।

— চুপ কর। অপরাধ করলে তিনি পুত্রকেও রেহাই দেন না।

—কিন্তু তুমি তো কোন অপরাধ করনি।

– আমি না করলেও তুমি করেছ। তুমি এখনো আমার রাণী। একই গৃহে বাস করছ। তাই অটেনের অভিশাপে চারদিকে অশান্তি। স্বর্ণ খনির শ্রমিকেরা পালিয়ে যাচ্ছে। তুমিই সব কিছুর মূলে।

নেফেরতিতি নীরব থাকেন।

ফ্যারও বলেন—তোমার জন্যে কী না করেছি। জীবনটুকু শুধু দিই নি। তুমি অটেনের মন্দির গড়ে তোলার জন্য শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তাই অনেক মন্দির অনেক সমাধি গৃহ তোমার চিত্র

দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলাম। তোমার রূপ আমাকে নেশাগ্রস্থ করেছিল, আর তোমার মন আমাকে আনন্দিত করেছিল। কিন্তু সব ভুল। আমি অয়কে আদেশ দিয়েছি যেখানে তোমার যত চিত্র আছে সব নষ্ট করে ফেলতে। মুছে ফেলতে। তোমার অস্তিত্ব এখন আমার কাছে বিষবৎ।

নেফেরতিতির মনে হয় এবারে তাঁর রক্তমাংসের দেহের অস্তিত্বও বোধহয় মুছে ফেলতে চান ফ্যারও। তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকান। সেই মুখ রক্তবর্ণ, চোখের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিকতা।

—তোমাকে আমি রাজধানীতে রাখতে চাই না। মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতাম। কিন্তু দিলাম না। কারণ জীবনের প্রথমে তুমিও অটেনের ভক্ত ছিলে। তাছাড়া আমাকে তুমি সম্ভবত ভালবাসতে।

নেফেরতিতির দৃষ্টি ফ্যারওর দিকে বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হয়। হ্যাঁ, জীবনের প্রথম লগ্নে মানুষটিকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন। তখন রাজনীতি আর প্রতিপত্তির লালসা তাঁকে এমন করে কলুষিত করেনি। নিজেও অবশ্য কম ভালবাসা পাননি। কিন্তু সেই সব দিনের কথা স্বপ্নের মত মনে হয় আজ।

স্বামীর কথার জবাবে তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—আপনার অসীম কৃপা।

—তুমি প্রস্তুত থেকো। হয়ত সাতদিনের মধ্যে রাজধানী ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে।

—আমি একা ?

—হ্যাঁ। তোমার যে অপরাধ, সেই অপরাধ আর কেউ করেনি।

—কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না ? যদি কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চায় ?

—না।

—এটাই আমার শেষ প্রার্থনা।

অখেন অটেন একটু বিচলিত হন। বলেন—কাকে নিতে চাও ?

—তুতন্খটেন।

—ওটাকে আবার কেন ?

—একলা থাকব কিনা। নিজের মেয়েদেরও পাবনা। তাই।

—বেশ। নিও।

ফ্যারও চলে যান। নেফেরতিতি বুঝতে পারেন এত সব সত্ত্বেও ফ্যারও তার প্রতি হৃদয়ের এক অজ্ঞাত কোণে এখনো একটু ভালবাসা সঞ্চিত রেখেছেন। নইলে তাঁর কথার ঝাঁঝ অমন কমে যেত না ধীরে ধীরে। তুতন্খকে সঙ্গে না নিয়ে উপায় নেই। অয় আর হোরেমহেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তাকে এখানে ফেলে

রেখে যাওয়া কখনই নিরাপদ হবে না। অসুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে ফ্যারও আর অপদার্থ স্নেনখকবে কত দিন টিকে থাকবে বলা মুশকিল ওই অতি উচ্চাশার স্বপ্ন দেখা মানুষ দু'টির জন্য।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সহসা বৃষ্টি হল একটু। এদেশে বৃষ্টি সর্বদাই অতি-প্রার্থিত। বৃষ্টি দেখে শহরের মানুষেরা ভীষণ পুলকিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। বর্ষণ এদেশে এক দুর্লভ ঘটনা। সবাই জানে, এই বৃষ্টি পিরামিডের ওপর যে সামান্য জলের স্পর্শ রাখল তা অতি সহজেই শুকিয়ে যাবে। তবু শত হলেও বৃষ্টি। আকাশ থেকে পড়ছে ঈশ্বরের কৃপার মত।

ফ্যারও ঘোষণা করে দিলেন অটেন দেবতা ওই বৃষ্টি পাঠিয়েছেন। অধিকাংশ প্রজা মনে মনে জানে অমেন দেবতা ছাড়া এই ক্ষমতা আর কারও নেই।

বৃষ্টির সময় অনখেসেন আর তুতনখ বাইরে ছিল। তারা গিয়েছিল নদীর তীরে। দিন শেষ হয়ে আসতে দেখে ওরা ফিরে আসছিল প্রাসাদে। সেই সময় বর্ষণ। তুতনখ চেঁচিয়ে ওঠে। অনখেসেন তার ডান হাত চেপে ধরে শক্ত করে।

—কি হল?

দেখছ না, ওপর থেকে জল পড়ছে। কী সুন্দর।

- হ্যাঁ। তুমি আগে দেখোনি?

— মনে হয় দেখেছি একবার।

—তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

--হবে না?

—নিশ্চয় হবে।

—আমি গাড়ি থেকে একটু নামব?

—চলো, আমরা দু'জনেই নামি।

ওরা পথে নেমে পড়ে। গায়ে ওদের বৃষ্টির জল পড়ে। পোষাক সামান্য ভিজে ওঠে।

তুতনখ হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে—কী আরাম, তাই না?

—হ্যাঁ।

—তুমি আজ অন্যমনস্ক কেন?

—আমি, কই না তো? তোমাকে নিয়ে বেড়াতে এলাম, বৃষ্টিতে রাস্তা ধরে হাঁটছি। অন্যমনস্ক হবো কেন?

তুতনখ একটু দাঁড়িয়ে পড়ে।

—থামলে যে।

তুতনখ বলে—জানো, আমি অনেক কিছু তোমার চেয়ে কম বুঝি। কিন্তু তোমার মন খারাপ হলে ঠিক বুঝতে পারি।

স্তম্ভিত হয়ে যায় অনখেসেন। বলে—কেন? শুধু আমার মন খারাপ হলে কেন?

— আর কাউকে জানিনা?

—ও।

বৃষ্টি থেমে যায়। বালুকাময় পথে বৃষ্টির ফোঁটার চিহ্ন বিলুপ্ত হতে বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। বর্ষণ এখন অতীতের কাহিনীতে পরিণত হল। আবার কত মাস বা কত বছর প্রতীক্ষা করতে হবে কে জানে।

ওরা দু'জন পাশাপাশি হেঁটে চলে। নির্জন পথ। ওদের গাড়ি ও রক্ষী ওদের অনুসরণ করে। দিবসের প্রচণ্ড গরম সামান্য এই বর্ষণে অনেক প্রশমিত।

ওরা আবার গাড়িতে ওঠে। তুতনখ আবার প্রশ্ন করে—তোমার কিসের দুঃখ আজ অনখেসেন?

—আমার কাছ থেকে তুমি যদি অনেক দূরে চলে যাও তাহলে তোমার কষ্ট হবে না?

—খুব হবে। কিন্তু তোমার তো হবে না।

—হবে। সেইজন্যই দুঃখ।

গাড়ির মধ্যে অনখেসেন তুতনখকে জড়িয়ে ধরে। বড় যত্নের বলে মনে হয় একে। একদিন এ যুবক হয়ে উঠবে। তখন নিশ্চয় খুবই সুদর্শন হয়ে উঠবে। মুখের এই কোমল ভাব আর থাকবে না। ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত সুন্দর উদাস রুক্ষতা বিরাজ করবে এই মুখমণ্ডলে। সেই সঙ্গে একটুখানি বেদনা মেশানো থাকবে যা দূর করার জন্য অনখেসেন ব্যাকুল হয়ে উঠবে। কিন্তু তেমন দিন কি আসবে কখনো? মা বলেছেন কয়েকদিনের মধ্যে তুতনখকে সঙ্গে নিয়ে তিনি থীব্‌স-এর পথে রওনা হয়ে যাবেন। ফ্যারওর নির্দেশ।

অনখেসেনের অশ্রুর কয়েক ফোঁটা ঝরে পড়ে তুতনখ-এর বাহুর ওপর। তুতনখ অনখেসেনের কোমল স্পর্শ উপভোগ করছিল এতক্ষণ। তার কেশ ও দেহ থেকে একটা অতি হালকা সুঘ্রাণ নাকে এসে লাগছিল। এখন অশ্রুর উষ্ণতায় সে চমকে ওঠে। অনখেসেনের গালে হাত দেয়।

—তুমি কাঁদছ।

অনখেসেন নীরব।

—কেন কাঁদছ? আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি?

—না। তুমি কষ্ট দিতে জাননা তুতনখ।

—তবে? সত্যিই কি আমি দূরে চলে যাব?

—হ্যাঁ তুতনখ হ্যাঁ। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

—আমি যাব না।

—তা যে হয় না। মা তোমাকে নিয়ে যাবেন। মাকে চলে যেতেই হবে। ফ্যারওর হুকুম।

তুতনখ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কি বলবে ভেবে পায় না সে। তার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। কিন্তু গোপন করার চেষ্টা করে। সে জানে তাকে কাঁদতে নেই। সে কাঁদলে অনখেসেন আরও কষ্ট পাবে।'

—জান অনখেসেন, অটেনের কৃপায় আমরা বেশীদিন আলাদা থাকব না। দেখে নিও। আমরা আবার এক হবো।

—তাই যেন হয়।

এবারে তুতনখ অনখেসেনের বুকের মধ্যে মুখ লুকোয়। সে অনখেসেনের বুকের ধুকধুকানি শুনতে পায়। অনখেসেন তার মাথা দু'হাত দিয়ে আরও বেশী চেপে ধরে। তুতনখ অনুভব করে অনখেসেনের বুকের ঝড় ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসছে। অবশেষে সে শান্ত হয় যেন। তখন তুতনখ আবার সোজা হয়ে বসে। কেউ কারও মুখ দেখতে পায় না তেমন করে। বাইরে অন্ধকার। গাড়ির ভেতরে সেই অন্ধকার আরও গাঢ়।

অনখেসেন লক্ষ্য করে তুতনখ তার চুল নিয়ে, তার মুখ নিয়ে, তার ঠোঁট নিয়ে খেলা করছে। তার মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। অথচ ওই স্পর্শে অনখেসেনের শরীরের ভেতর থেকে কি যেন জেগে উঠতে চায়। সে সংযত থাকে। নিজেকে বার বার বোঝায়, না না, এ বালক। কিন্তু শেষে সে আর না পেরে তুতনখকে পাগলের মত চুমু খেতে থাকে। তুতনখ প্রথমে অবাক হয়। তারপর দেখাদেখি সে ও চুমু খায় অনখেসেনকে।

নেফেরতিতি রাজধানী থেকে বিদায় নিতে প্রস্তুত হলেন একদিন। সঙ্গে তুতনখ-অটেন। সবাই জানল ফ্যারওর জীবন থেকে এই অসামান্যা সুন্দরী প্রধানা মহিষী চিরতরে বিদায় নিতে চলেছেন। অটেম দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা ফ্যারও

কখনো সহ্য করেন না। বিশেষ করে নিজেকে অটেনের পুত্র বলে ঘোষণা করার পর রাণীর এই বেয়াদপি ক্ষমার অযোগ্য। এতে প্রজারাও অটেনের প্রতি ভয় শ্রদ্ধা ভক্তি আস্থা সব হারিয়ে ফেলবে। নেফারতিতি যদি দেবতা সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করতেন অন্তত, তাহলে তাঁকে এই শাস্তি ভোগ করতে হতো না। কিন্তু তিনি অটেনকে অপদস্থ করার জন্য অমেন দেবতার শরণাগত হলেন।

বিদায় নেবার বেলায় মার্তকে ডেকে তিনি বললেন– এবারে তুই সত্যিই রাণী হলি।

—না। স্মেনখকরে এখনো সহ-শাসক।

—তাতে কি। অন্য কোন রাণী তো আর রইল না। তোকে সবাই রাণী বলবে। তাছাড়া তোর বাবা কতদিন আর পারবে। দুদিন পরেই উন্মাদ হয়ে উঠবে। আমি চিকিৎসকের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতাম বলে বেশী বাড়াবাড়ি হতোনা। আমি নিজে তার কাছে যেতে না পারলেও ব্যবস্থা করেছিলাম। তবে অয় আর হোরেমহেব বোধহয় সন্দেহ করত। এবারে তারা স্বাধীন। স্মেনখকরকে বলিস খুব সাবধান থাকতে।

আতঙ্কিত মার্ত প্রশ্ন করে—তুমি কি কোন ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছ?

—না। তবে ফ্যারওর সিংহাসনের চারদিক ঘিরে চিরকাল ষড়যন্ত্র বাসা বেঁধে থাকে। চোখ আর কান সব সময় খোলা রাখতে হয়। নইলে বিপদ। সেই কাজ আজ থেকে তোকে করতে হবে। আমি ফ্যারওর আশেপাশে না গেলেও সবাই জানত নেফেরতিতি প্রাসাদে রয়েছে। এখন তারা জানবে নেফেরতিতিকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

মার্ত-এর মন প্রবোধ মানে না।

অনখেসেন আর তুতনখ-এর এসব কথা কানে যায় না। অনখেসেন ভাবে, তুতনখ চিরকাল প্রাসাদে বাস করেছে অথচ তার দিকে আগে ভালভাবে তাকানোর অবকাশ পায়নি সে। কিন্তু নেফেরতিতি তার মনের মধ্যে এমন এক বীজ বপন করে দিলেন যে সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বের হয়ে এখন সেটি বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। নইলে মন তার এত ব্যথাতুর কেন? কেন তুতনখ-এর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না? এর চেয়ে আগেই ভাল ছিল। তুতনখকে সে অন্য পাঁচজন বালকের মত ভাবত। মা শুধু শুধু তার মনের ফল্গুধারার উৎসমুখের পাথরটিকে স্থানচ্যুত করে দিলেন। এর থেকে অব্যাহতি লাভের সম্ভাবনা নেই আর। কারণ মায়ের স্বপ্ন সফল ও বিফল হওয়া—দুটোই মর্মন্তুদ হবে। একদিকে স্মেনখকরে অন্যদিকে তুতনখ। পাল্লার দুই দিকে

দু'জনে। একজন নামলে অন্যজন উঠবে। না না, এ ঠিক নয়। শত হলেও মার্ত-এর অমঙ্গল সে চাইতে পারে না।

নেফেরতিতি তার দিকে চাইলে সেই দৃষ্টির মধ্যে অনেক কথা ফুটে উঠতে দেখে। মায়ের চোখের ভাষা সে বুঝতে পারে। তবু তার চির-পীড়িত দ্বিতীয় ভগিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে—মকত্ অটেনকে নিয়ে গেলে পারতে মা। ও অসুস্থ।

—জানি। কিন্তু নিতে পারি না।

—কেন ?

—তোদের মত মকত্ ও ফ্যারওর সন্তান। হুকুম নেই।

—মক্ত কে একবার অন্তত দেখে যাও। জীবনে নিশ্চয় আর তাকে দেখতে পাবে না।

—তোদেরও কি দেখতে পাব ?

—তবু সম্ভাবনা নিশ্চয় আছে। ওকে দেখার কোন সম্ভাবনাই নেই।

—গেলে কাঁদবে, তাই যাইনি। চোখের জল আর ভাল লাগেনা।

অনখেসেন অনিচ্ছাকৃতভাবে একটু জোরে বলে ওঠে—তোমারই গর্ভের দুর্বলতম সন্তান ও। দরদ না থাকুক, ওর প্রতি তোমার শেষ কর্তব্যটুকু অন্তত করে যাও।

নেফেরতিত এবারে ঘুরে দাঁড়ান। তিনি তৃতীয়া কন্যার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। সেই মুখ অগ্নিবর্ণা। এই রূপ কখনো তিনি দেখেন নি। তাঁর ব্যক্তিত্বও এর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শান্ত কণ্ঠে মা বলেন—চলো।

সবাই অনখেসেন ও নেফেরতিতির পেছনে পেছনে চলে। তারা মক্ত-অটেনের কক্ষের সম্মুখে এসে থেমে যায়। প্রায়ান্ধকার এই কক্ষ। মক্ত আলো পছন্দ করে না। চোখে সয় না।

নেফেরতিতি এক পা এক পা করে এগিয়ে যান। সঙ্গে অনখেসেন। তাঁরা উভয়ে মক্ত-এর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। শয্যায় শায়িত রয়েছে অতি ক্ষীণ এক দেহ। নিস্পন্দ। মুখও ভাল করে দেখা যায় না।

নেফেরতিতি বলে ওঠেন—উঃ, এত অন্ধকার কেন ?

—ও তো এই অন্ধকারেই থাকে বরাবর। কেউ ওকে আলো দেখায় নি কখনো।

—এভাবে কথা বলছ কেন ? আরও বড় হও, তখন দেখবে আপাতদৃষ্টিতে

আমার যে সব কথা, যে সব আচরণ তোমাকে বিরূপ করেছে তখন আর তা করবে না। আমার সমালোচনা তুমি করতে পার, কিন্তু সব কিছুর পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। তুমি বড় হও। আমার মত বড় হও। তুমি সন্তানবতী হও। দেখবে, তোমার সন্তানরাও তোমার কাজের কত সমালোচনা করছে।

মায়ের হাত চেপে ধরে সে বলে—আমি সমালোচনা করতে চাইনি মা। তোমাকে নিষ্ঠুর হতে দেখলে বড় কষ্ট হয়।

ওরা কয়েক মুহূর্তের জন্য মকুত অটেনের কথা বিস্মৃত হয়েছিল। এখন ঘরের অন্ধকার চোখ সওয়া হয়েছে। মকতু-এর মুখ ভালই দেখা যাচ্ছে। চক্ষু নিমীলিত।

অনখেসেন ভগিনীর গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—মকুত।

কোন সাড়া নেই।

—মা, এযে কথা বলছে না। নড়ছে না।

—কেন ? নড়ছে না কেন ? দেখি।

নেফেরতিতি বারবার কন্যাকে ডাকেন। কিন্তু সে কথা বলে না। নড়ে না। নেফেরতিতি রীতিমত বিচলিত বোধ করেন। বেশ উচ্চকণ্ঠে বলেন এবারে—আমি তোর মা। দেখতে এসেছি। একবার চেয়ে দেখ।

না। মকুত অনড়ই রইল। তার হাত পা একটু শক্ত শক্ত মনে হয়। সে মৃতা।

নেফেরতিতি এবারে কন্যার শিয়রে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বলেন—তোর ওপর মায়া পড়ে যাবে বলে আমি দূরে দূরে থেকেছি। এইভাবে শোধ নিলি।

মকুত কিভাবে যেন বিষ সংগ্রহ করেছিল। হয়ত অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত ছিল। আজ তার সময় হয়েছিল। মৃত্যু বরণের উপযুক্ত সময়। তাই বোধহয় মায়ের অশ্রুজলের দুফোঁটা উপহার স্বরূপ পেয়ে গেল জীবনে এই প্রথম এবং শেষবারের মত।

কিন্তু তার এই বিদায় নেফেরতিতির বিদায়কে কয়েকদিনের জন্য বিলম্বিত করল মাত্র। তার মৃত্যু প্রাসাদের কারও মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাতও করতে পারল না। কারণ, নিজ কক্ষের গণ্ডী পেরিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে মেশার মত অবকাশ সে পায়নি কখনো।

অনখেসেন ভেবেছিল মা তাঁর নিজের বোন মুতনেজেমেতকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ মকুত-এর মৃত্যুর দিনেও দেখা যায় নি,

যেদিন তিনি প্রকৃতই থীবসের দিকে রওনা হলেন সেদিনও দেখা গেলনা। মুতনেজেমেত-এর সঙ্গে ফ্যারও কন্যারা খুব বেশী মেলামেশা করত না। যদিও সে নেফেরতিতির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, প্রায় মার্ত-অটেনের বয়সী তবু কেন যেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি। নেফেরতিতি তাকে একটু আলাদা করে সরিয়ে রেখেছেন বরাবর। পরিচারিকারা ফিস ফিস্ করে বলত, ভয়ে রাণী ওকে আড়াল করে রাখেন। যদি ফ্যারওর দৃষ্টি পড়ে যায় ওর ওপর।

তাই বলে মুতনেজেমেত তার ভগিনীর মত অতটা রূপসী নয়। তবে মোটামুটি সুন্দরী। কিন্তু যে সৌন্দর্য পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয় তার ধারে কাছেও নয়। সেই সৌন্দর্য এখন প্রাসাদে শুধু একজনের আছে। অনখেসেনের।

নেফেরতিতি যাবার আগে বলে গেলেন কন্যাদের তাঁর বোন একলা থাকল। একটু কথাবার্তা বলতে তার সঙ্গে। সে একবারে একা হয়ে গেল।

অনখেসেনের মনে হতে লাগল প্রাসাদ শূন্য, হৃদয় শূন্য। পৃথিবীতে যে দুজনকে সব চেয়ে আপন বলে ভাবতে শুরু করেছিল, তারা চলে গেল। মার্ত এখন বলতে গেলে প্রকৃত রাণী। তার কাছে যখন তখন যাওয়া যায় না। মকেত মৃত। তার কক্ষের দিকে চাইলে গা ছমছম্ করে। মনে হয়, কান পাতলে এখনো তার চাপা বেদনার্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যেন ডাকছে তাকে। তার দেহ শুধু চলে গিয়েছে সমাধিস্থলে। বাকী সবটুকু রয়ে গিয়েছে এখানে। এমন কি তার আশা-আকাঙ্খা, ব্যাথা-বেদনা এবং দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত।

অন্য তিন বোন খুব ছোট। তারা পরিচারিকাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তারা তিনজনে যেন ভিন্ন এক গোষ্ঠীর প্রাণী। সব সময় একই সঙ্গে থাকে, একই সঙ্গে খেলা করে, গল্প করে। পৃথিবীতে মা বলে যে বিশেষ কেউ থাকে এই বোধও তাদের নেই। তাদের ধারণা পৃথিবীতে তারা চিরকাল আছে, থাকবেও চিরকাল।

ক'দিন হলো বড় বেশি দেখা হয়ে যাচ্ছে হোরেমহেবের সঙ্গে। আনাচে কানাচে অলিন্দে—যত্রতত্র। অনখেসেন বুঝে উঠতে পারে না কেন এমন হচ্ছে। হোরেমহেবকে ফ্যারও বোধহয় বিশেষ ধরণের কোনো কাজে নিযুক্ত করেছেন। অনখেসেন সংকোচে সরে আসে। যখনই দেখা হয়, লোকটা সম্বন্ধে তার মায়ের

ন্তব্য কানে বাজে। নইলে তার খ্যাতি রয়েছে যথেষ্ট। সে বুদ্ধিমান, একেবারে অসুন্দরও বলা যায় না। বেশ বলিষ্ঠ পুরুষালী চেহারা। সেনানায়ক হবার উপযুক্ত। সে যুবক। তবে অনখেসেনের চেয়ে অন্তত পনেরো বছরের বড় হবে।

মা কখনো ফাঁকা মন্তব্য করেন না। তাঁর প্রতিটি কথার যুক্তি আছে। তাই হোরেমহেবের সঙ্গে এভাবে দেখা হতে থাকায় একটু অস্বস্তি অনুভব করে সে।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে হারেমের বহির্দ্বারের কাছে একেবারে সামনা-সামনি দেখা হয়ে যায়। সরে যাবার চেষ্টা করলে হোরেমহেব মৃদুকণ্ঠে বলে—একটু দাঁড়ান।

অনখেসেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

হোরেমহেব এগিয়ে এসে তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ে বলে—আমি তোমার রূপে মুগ্ধ। তোমাকে ভালবাসার জন্যে আমি উন্মত্ত। আমাকে তুমি অনুগ্রহ কর।

ছিটকে দূরে সরে যায় অনখেসেন। বলে—এভাবে কখনো আসবেন না। আমি ফ্যারওকে জানাতে বধ্য হব।

হোরেমহেব একটিও কথা না বলে চলে যায়।

অনখেসেনের বুক কাঁপতে থাকে। সেই কাঁপুনি তার হাঁটু দুটিতে সংক্রামিত হয়। তবু এক নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দে সে পুলকিত হয়ে ওঠে। এতবড় একজন পুরুষ, দেশের প্রধান সেনাপতি তার সামনে নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা চাইছে। তার রূপে সে মুগ্ধ। রূপের এই মর্যাদা আর কেউ কখনো দেয় নি তাকে। খুব ভাল লাগে তার। কিন্তু মায়ের সাবধান বাণীর কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়। এদের উত্তুঙ্গ উচ্চাশার সীমারেখা নেই। সেই উচ্চাশা পূরণের জন্য এরা সব কিছু করতে পারে। একজন নারীর মন গলানো তার মধ্যে একটি—যদি সেটা উচ্চাশা পূরণের পরিপূরক হয়। তার সঙ্গে বিবাহ হলে হোরেমহেব ফ্যারওর আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারবে। জামাতা হিসাবে আরও কাছের মানুষ হবে। কিন্তু তাতে কি লাভ? এখনই তো যথেষ্ট কাছের মানুষ এবং ফ্যারওর বিশ্বাসভাজন। তবে কি সত্যিই তার রূপে ভুলেছে মানুষটা? তাই যদি হয় তাহলে অমন এক সুঠাম দেহের পুরুষ অত কাতর ভাবে প্রেম নিবেদন করলে কি ভাবে সে অস্বীকার করবে? মনের সেই জোর তার আছে তো? তুতেনখ-এর কথা মনে হয়। মা তাদের দুজনার ভবিষ্যৎ নিয়ে এক বিশেষ ধরনের স্বপ্ন দেখেন। এর আকৃতিতে মন ভুললে মায়ের সেই স্বপ্ন ফলবতী হবে না। যদিও

মায়ের স্বপ্নের কোন ভিত্তি নেই। স্মেনখকরের জীবনের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। কেন এই সন্দেহ, ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন নি। একটা অনুভূতি মাত্র। হোরেমহেব একজন জ্বলজ্যান্ত বলিষ্ঠ পুরুষ। প্রেম নিবেদনের সময় তার কণ্ঠের ভগ্ন স্বরের মধ্যে রীতিমত উত্তেজনা ও উম্মাদনা ঝরে পড়েছিল। একটা অত্যন্ত সুখদায়ক কম্পন ছিল সেই কণ্ঠস্বরে। এই বয়সে আসতে তুতেনখ-এর অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন তার নিজের রূপের জেল্লা কতটা অবশিষ্ট থাকবে কে জানে। তাছাড়া তাকে শৈশব থেকে দেখে দেখে তুতেনখ কি তার রূপের মূল্য অনুধাবন করতে পারবে? এই দীর্ঘ সময় সে কি নিয়ে থাকবে? মায়ের কথায়, হোরেমহেব সুবিধার মানুষ নয়। কিন্তু এভাবে যদি আর দুদিন তার সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে নিজেকে কি স্থির রাখতে পারবে? বুঝতে পারে না অনখেসেন।

সেইদিনই মার্ত অনখেসেনকে ডেকে পাঠায় তার নিজস্ব কক্ষে। মা চলে যাবার পরে সে মায়ের কক্ষগুলি নিয়ে নিয়েছে। ফ্যারও আপত্তি করেন নি। মার্ত এমনিতে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কাউকে কোন বিশেষ কথা বলার সময় নিজের কক্ষে ডেকে পাঠায়। তাদের মা নেফেরতিতিও এমন করতেন। মায়ের কাছে শিখেছে। এতে রাণীর মর্যাদা বাড়ে।

অনখেসেন মার্তের সামনে গেলে সে মুচকি হেসে বলে—শুনলাম, খুব মানুষ ভুলিয়ে বেড়াচ্ছিস?

—তার মানে?

—তুই জানিস না বলতে চাস? মনে রাখিস এখন আমি রাণী। আমার অনেক চোখ।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু মানুষ ভুলিয়ে বেড়ানোর কথা আমি নিজেও জানিনা।

—হোরেমহেব তোকে প্রেম নিবেদন করেনি?

- ও। এই কথা।

—কেন, কথাটা কি খুব নগণ্য?

—তা বলছি না। তবে আমি তাকে ভোলাতে যাই নি। ভোলাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই।

মার্ত একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলে—তবে বুঝি ও নিজেই ভুলেছে?

—জানিনা। আমার প্রয়োজন নেই জানার।

এবারে মার্ত গম্ভীর হয়ে বলে—ওর অভিনয়ে ভুলিস না। আমি মানছি যে ও

যথেষ্ট সুপুরুষ। বহু গুণ রয়েছে ওর মধ্যে। কিন্তু ও তোর কাছে এসে অভিনয় করছে।

—কি করে বুঝলি ?

—একজন মানুষ একসঙ্গে কতজনের কাছে প্রেম নিবেদন করে ?

—আর একজন কে ?

—মায়ের বোন মুতনেজেমেত।

—সত্যি ?

—মিথ্যে বলে লাভ ?

অনখেসেন ভাবে, ভালই হল। হোরেমহেবের আকৃতিতে ভবিষ্যতে আর মন টলবে না। মার্ত তার মস্ত উপকার করল।

—তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নইলে ও হয়ত আমার মন জয় করে নিত। কিন্তু লোকটার উদ্দেশ্য কি ?

—ফ্যারওর বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন।

—কিন্তু কেন ?

-বোধহয় নিজের বংশের গৌরব বৃদ্ধি করা।

—শুধু কি তাই ?

—আর কি হতে পারে ?

অনখেসেন একটু ইতস্তত করে বলে—হয়ত ফ্যারওর পদটির ওপরও লোভ আছে।

মার্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলে—আমারও সেই রকম একটা ভয় আছে। বাবা সুস্থ নয় এ কথা সবাই এখন মোটামুটি জেনে গিয়েছে। শুধু ফ্যারও বলেই ওঁকে এখনো ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয় না। আর স্মেনখকরের বুদ্ধি ঠিক পরিণত নয়।

—কি করে বুঝলি ?

—বোঝা যায়। শত হলেও আমি তার স্ত্রী।

—এ তো শুধু লোক দেখানো। স্বামী হিসাবে সে কি সম্পূর্ণ ?

—না। তবে ফ্যারওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলেও চলে যদি তার পরামর্শদাতারা, তার কর্মচারীরা দক্ষ হয়, বিশ্বস্ত হয়।

—অয়-এর মত দক্ষ কেউ হতে পারে ?

—না। কিন্তু অয় স্মেনখকরেকে পছন্দ করে না। তাই তেমন দিন যদি আসে একটুও দ্বিধা না করে সে স্মেনখকরেকে বিতাড়িত করতে পারে। কিংবা তার

ভ্রাতৃস্পুত্রের মত অন্য কিছু।

—এতটা দুঃসাহস হবে ?

—কি জানি।

—আমার ধারণা এই সাহস অয়-এর হবে না। কারণ হোরেমহেব রয়েছে। প্রধান সেনাপতি সে। সৈন্যদল তার হেফাজতে। মা একবার বলেছিলেন, ওরা দুজনা পরস্পরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে বলে ভরসা। কেউ বেশীদূরে এগিয়ে যেতে পারে না।

—কিন্তু কোন সময় একটা সুযোগ এসে যেতে পারে।

—একশোবার।

—তখন কি হবে ?

—অত ভাবলে চলে না। তবে তুই স্মেনখকরের দিকে দৃষ্টি রাখিস। কেন যেন মনে হয় আমাদের চারদিকের নিরাপত্তার বেষ্টনী আগের মত আর নিশ্ছিদ্র নয়।

—আমারও তাই মনে হয়। প্রাসাদ কিংবা প্রাসাদের বাইরে এক এক জায়গায় এমন সব মানুষকে দেখতে পাই যাদের সেখানে মানায় না। সেখানে থাকার কথাও নয়। রাতের বেলায় ছায়া মূর্তিও দেখি যেন। সবই কি আমার চোখের ভুল ? তোর কি মনে হয় ?

—বুঝি না। তবে অনেক কম বয়স থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে আছে। এখন ফ্যারওকে দেখে মনে হয়, তাঁর মনের রোগ আমার মধ্যে রক্তের মাধ্যমে চলে এসেছে বুঝি। আমিও পাগল হয়ে যেতে পারি।

—বাজে কথা।

—হয়ত তাই। আমিও মাঝে মাঝে ভাবি, এই সব অবাস্তব আশঙ্কাকে আমল দেব না। কিন্তু পারিনা। মা চলে যাবার পর থেকে দিন দিন সাহস হারিয়ে ফেলছি।

ফ্যারও অখেন-অটেনের মৃত্যু হল। এই মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর মানসিক ভারসাম্য একেবারে হারিয়ে ফেলেন। তবে নিজের

মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন শেষ পর্যন্ত। অয়কে আর স্মেনখকরেকে প্রায়ই বলতেন, তিনি আর বাইরে আসবেন না। তাঁর দিন ভাল যাচ্ছে না। তিনি সুস্থ নন।

তাঁর ক্ষুধা কমতে থাকে দিনের পর দিন। আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝে নেফেরতিতির নাম উচ্চারণ করতে থাকেন।

অনখেসেন একদিন ফ্যারওর মুখে মায়ের নাম উচ্চারিত হতে দেখে প্রশ্ন করেছিল – মাকে ফিরিয়ে আনব ?

—এ্যা ?

—মাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব ?

—কে মা ?

—সম্রাজ্ঞী নেফেরতিতি।

একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে যেন মুখের ওপর। ঘাড় দুলিয়ে বলেন—খুব ভাল। খুব ভাল।

—তাঁকে থীবস থেকে আনতে পাঠাব ?

—কি বললি ! না খবর্দার।

তিনি শেষের দিকে খাওয়া দাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। প্রাসাদের চিকিৎসক পেপির শত চেষ্টা বিফলে গেল। তাঁর দেহ শয্যায় মিশে গেল। অবশেষে মৃত্যু এল।

ফ্যারওর নামের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন রাজধানী তেল-এল-আর্নেবের নামও রাখা হয়েছিল অনখেটটেন। সেই সময়ে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সমাধিস্থল নির্মাণ করা হয়েছিল পূর্বদিকের মরু পাহাড়গুলো খনন করে। অখেন-অটেন নিজের সমাধিস্হলও নির্মাণ করেছিলেন ওয়াদিতে। ওয়াদিতে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর শবদেহ। সঙ্গে চলল বহু ভোগ্যপণ্য, বহুমূল্য আসবাবপত্র, স্বর্ণালঙ্কার, খাদ্য-সামগ্রী। সমাধির অভ্যন্তরে সেগুলো ফ্যারওর ব্যবহারে লাগবে।

প্রজাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র শোকের ছায়া নামলো না ফ্যারও এর মৃত্যুতে। তারা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এবারে বোধহয় তারা তাদের প্রাণের দেবতা অমেনের পুজা করতে পারবে। এবারে বোধহয় সৈন্যরা আবার দিগ্বিজয়ে বের হবে। এবারে আবার ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। প্রজাদের বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটবে। অখেন-অটেমের পিতা তৃতীয় অমেনোফিসের মৃত্যুর পর সব কিছুই বিসর্জন দিয়েছিলেন পুত্র। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল অমেন দেবতার পরিবর্তে অটেনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অমেনের

প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধাকে বিদ্বেষে পরিণত করা। তিনি সম্পূর্ণ বিফল হলেন। প্রকৃতির আর স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে নিজেই হলেন অপ্রকৃতিস্থ। প্রজাদের কাছে হলেন অনভিপ্রেত।

কিন্তু অন্যদের প্রতিক্রিয়া যাই হোক, পিতার শবদেহ প্রাসাদ থেকে নির্গত হলে অনখেসেন ভুলুণ্ঠিতা হয়ে অশ্রুবিসর্জন করল। সে জানে, পিতা যেমনই হোন, মায়েব প্রতি তাঁর ভালবাসা অটুট ছিল শেষদিন পর্যন্ত। অনেক প্রমাণ সে পেয়েছে। তার অবস্থা দেখে মার্ত ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল।

—তুই হাসছিস্ মার্ত।

—তবে কি কাঁদব? ওই মানুষটা কার কবে কতটুকু উপকার করেছে সারাজীবনে?

—আর কার কবেছেন বলতে পারব না। তবে তোর উপকার করেছেন। তোকে রাণী বানিয়ে দিয়েছেন।

—এমনিতেই হতাম।

অনখেসেন আঘাত পায়। সে বলে—অখেন-অটেন যত খারাপই হোন, তিনি তোর স্বামীর নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে রেখেছিলেন।

—কিভাবে?

—এতদিন ফ্যারওর শত্রুপক্ষ জানত, একজনের মৃত্যু হলে অন্যজন রয়েছেন। কিন্তু এখন তোর স্বামী বে-আব্রু। তাকে সরাতে পারলেই উচ্চাকাঙ্খীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সামনে শুধু একটি বাধা এখন।

মার্তের মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে যায়। তার চোখে ফুটে ওঠে আতঙ্ক।

সে বলে--তাই তো। তুই একদিন বলেছিলি বটে হোরেমহেবের উচ্চাকাঙ্খার কথা। এমন আরও অনেকে আছে কিনা কে জানে।

অনখেসেন চুপ করে থাকে। কী বলবে সে? বলার কিছু নেই। পিতার মৃত্যুর পর নেফেরতিতির অভাব আরও তীব্রভাবে অনুভব করে সে। এই সময় মা থাকলে বড় ভাল হতো। তাঁর উপস্থিতি মার্ত আর স্মেনখকরের পক্ষেও মঙ্গলজনক হতো।

কিছুদিন পরে স্মেনখকরের সম্মতি নিয়ে পিতার সমাধিস্থল পরিদর্শনে যায় অনখেসেন। সেটি এখন প্রস্তরখণ্ড দিয়ে গেঁথে ফেলা হচ্ছে। চারদিকে প্রহরী

বেষ্টিত। শ্রমিকদের এমনভাবে এক একদিন এক এক জায়গায় কাজ দেওয়া হয়েছে যে সমাধির গর্ভগৃহের হদিশ তারাও পাবেনা। তারা জানেনা ঠিক কোথায় শবদেহ এবং কোথায় বহুমূল্যবান সামগ্রী রাখা হয়েছে। কারণ ভবিষ্যতে তারা সমাধিক্ষেত্র খনন করে সেই সব দ্রব্য অপহরণ করতে পারে। এমন ঘটনা ঘটেছে অতীতের কয়েকজন ফ্যারওর সমাধিক্ষেত্রে। অপহরণকারীরা দক্ষ শ্রমিক। তারা সোজাপথে না গিয়ে অন্যদিকে সিঁধ কেটে সমাধিগর্ভে প্রবেশ করে। কেউ বুঝতেও পারে না। সেই পথেই তারা মহামূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করে পালিয়ে যায়। অনেকের ধারণা অপহরণকারীদের পূর্বপুরুষেরা ওই সমস্ত পিরামিড বা সমাধিক্ষেত্রে কাজ করেছিল। বংশ পরম্পরায় তারা জানত সমাধির নকশা কেমন। নইলে ওভাবে চুরি করা অসম্ভব। তাই অখেন-অটেনের সমাধি-স্থল প্রহরী বেষ্টিত। শ্রমিকদের এক একদিন এক একদিকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে। অনখেসেন ভাবে, এভাবে কি রক্ষা করা যাবে ?

মরুপথ ধরে এগিয়ে চলে অনখেসেনের গাড়ি—সঙ্গে অনুচরবৃন্দ। চারদিকে ধূ ধূ বালুকারাশি। বৃদ্ধের বলিরেখাসদৃশ কুঞ্চিত বালুকাস্তর সম্মুখে। কোথাও কোথাও বালিয়াড়ির মত বালুকাস্তূপ।

পিতার নির্মীয়মান শেষ আশ্রয়স্থলের কাছে পেঁছে গাড়ি থেকে অবতরণ করে সে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। শ্রমিকেরা কর্মব্যস্ত। কোন দিকে লক্ষ্য করার ফুরসৎ নেই তাদের। তাদের কাজের তদারকি করছে কিছু সর্দার শ্রেণীর লোক। মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে ধমকে উঠছে কোথাও কোন শ্লথতা নজরে পড়লে।

সেই সময় একজন তরুণ শ্রমিক দলছুট হয়ে এগিয়ে আসে মৃত ফ্যারাও-এর কন্যা সমীপে। অনখেসেন অবাক হয়। সবাইকে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আজ সে পরিদর্শনে আসবে। সবার মধ্যে তাই অতিমাত্রায় কর্মব্যস্ততা। তারা জানে, কাজে ঢিলে দিলে তাদের ওপর মর্মান্তিক নিপীড়ন হতে পারে। পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হবে তারা। তবু তরুণটি তার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন জানায়। ঘর্মাক্ত পেশীবহুল মানুষটির দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয় অনখেসেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রবল অনুসন্ধিৎসা জাগে। এই দুঃসাহস যুবকটি পেল কোথা থেকে। কী তার অভিপ্রায় ?

—আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জেনেশুনেই অন্যায় করেছি আপনার কাছে এসে।

—কেন এসেছ ? কি চাও ?

—আমার বাবা গতকালও এখানে কাজ করেছে। আজ সে নেই।

—আসেনি ?

—সে পৃথিবীতেই নেই। কাজ করতে করতে মুখ দিয়ে রক্ত উঠল আর মরে গেল। ওই যে কালো রঙের পাথরটা পড়ে রয়েছে দেখছেন। ওইখানে পড়ে মরে গেল।

—সে কি! তোমার বাবা অসুস্থ ছিল ?

—না। আমার চেয়েও মজবুত ছিল তার দেহ। সে চাষ করত। এখন চাষের সময়। ফসল ফলাবার সময়। তবু তাকে জোর করে ধরে আনা হয়েছিল। তাই অনাহারে থাকতে হয়েছে আমাদের গোটা পরিবারকে। আমার ছোট বোন আগেই মরেছিল। বাবা কালকে মরল। আমি দুদিন না খেয়েও বেঁচে আছি। আরও কয়েকদিন বাঁচব। কিংবা আপনার সামনে দাঁড়াতে দেখে আজও ফ্যারওর লোকজনেরা আমাকে মেরে ফেলতে পারে।

—না। কেউ তোমাকে মারতে পাববে না।

—মারুক। সেই ভয় নেই! আমি বলতে এসেছি এভাবে আমাদের অনাহারে রাখলে মৃত অখেন-অটেনের আত্মাও শান্তি পাবেন না। আগের ফ্যারওরাও যেমন পাচ্ছেন না। তাঁরা তাঁদের খাদ্য স্পর্শ করতে পারছেন না আমরা অভুক্ত বলে। তাঁরা ছটফট্ করছেন।

—কি বলছ তুমি ?

—আমার বিশ্বাসের কথা বলছি।

—যুগ যুগ ধরে এই নিয়ম চলে আসছে। একে পরিবর্তন করা যায় না।

—ফ্যারওদের মৃত আত্মারাও তাই অতৃপ্ত রয়েছেন যুগ যুগ ধরে।

—না।

—আপনি আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আর পারছি না। নীলনদের পলিমাটি শুকিয়ে যাচ্ছে। সেখানে সবুজের সৃষ্টি হচ্ছে না। উর্বর ভূমি ব্যর্থতায় কাঁদছে। যারা কান পাততে জানে তারা এই কান্না শুনতে পাচ্ছে।

ঠিক সেই সময় যেন ভূতল জঠর থেকে আবির্ভূত হল হোরেমহেব। অনখেসেন বিস্মিত হয়। কোথা থেকে এল মানুষটা ?

হোরেমহেব ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বলে—তুমি এখানে এসেছ কেন ? উনি ডেকেছেন ?

অনখেসেন সঙ্গে সঙ্গে বলে—হ্যাঁ। আমি ডেকেছি।

যুবক হতবাক। হোরেমহেব বলে—আপনি ? এই অপরিচ্ছন্ন শ্রমিককে আপনি ডেকেছেন ? কেন ?

অনখেসেনের মাথা গরম হয়ে ওঠে। বলে—আমার কৌতূহল হয়েছে। তাই।

—অদ্ভুত আপনার কৌতূহল।

—আপনার এখানে আসাও অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। কেন এসেছেন?

হোরেমহেব শ্রমিকটিকে চলে যেতে ইশারা করে। সে চলে গেলে বলে—আপনারই জন্যে।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ। আপনি অল্প কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে এতদূরে এসেছেন শুনে আমি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম। ফ্যারও হয়ত বুঝতে পারেন নি। তাই আপনাকে আসতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

—আপনার উৎকণ্ঠিত হবার প্রয়োজন ছিল না।

—কত সহজে কথাটা আপনি বললেন। অথচ যদি আমার বুকের ভেতরটা দেখাতে পারতাম তাহলে বুঝতেন হৃদয়ে কোথায় আপনাকে স্থান দিয়েছি।

অনখেসেন বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলে—আপনাকে দেখাতে হবে না। মুতনেজেমেত তাহলে স্থানচ্যুত হয়ে যাবেন। তার চেয়ে তিনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। শত হলেও তিনি আমার মায়ের সবচেয়ে ছোট বোন। বয়সের তারতম্যেও ঠিক মানানসই হবেন।

হোরেমহেব কয়েক মুহূর্ত স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। সে একজন বাস্তববাদী সুচতুর মানুষ। তাই নিজের অস্বস্তির কথা অনখেসেনকে জানতে দিতে চায় না। সে সহাস্যে বলে ওঠে—বয়স? নারী পুরুষের প্রেমের রাজ্যে বয়স কোন প্রতিবন্ধক হয়নি কখনো। ভুলে যাবেননা আপনার পিতামহ নিজ কন্যাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাছাড়া মুতনেজেমেত আমার হৃদয়ের ত্রিসীমানায় নেই।

—বেচারা। আর কতজনের সঙ্গে এই অভিনয় করছেন?

—আপনার পিতা আমাকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তাতে অনেক নারী আমার সংস্পর্শে আসতে চায়। সুতরাং অভিনয় হয়ত করতে হয়। শুধু আপনি ছাড়া। আপনার জন্য আমার রাতের নিদ্রা গিয়েছে।

—আর দিনের আহার? তাও নিশ্চয় গিয়েছে।

—আপনি বিদ্রূপ করতে পারেন। আপনার বিদ্রূপও আমার কাছে মধুময়।

অনখেসেন এবারে সত্যসত্যই বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে—আপনি প্রধান সেনাপতি। এতগুলো প্রজার সামনে দৃশ্যের অবতারণা করে কোন লাভ নেই। আমি পিতার সমাধিস্থল নিশ্চিন্তে দেখতে এসেছিলাম। আমার সাধ মিটেছে।

পরে কখনো সম্ভব হলে আবার আসব। আপনি এবার অনুগ্রহ করে আমাকে নিষ্কৃতি দিন।

হোরেমহেব মষীবর্ণ মুখে স্থান ত্যাগ করে। প্রথম দিনের ঘটনায় লোকটির প্রতি সামান্য একটু দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল মনে। কিন্তু মুতনেজেমেতের কথা শুনে সে নিজেকে শক্ত করে ফেলেছে।

দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় দেখা যায়। অনখেসেন জানে ওই সমস্ত পাহাড়ের অনেক গুলোতেই রয়েছে পুরাকালের বহু ফ্যারওর দেহ। শ্রমিক যুবকটি ওদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই বলেছিল—ফ্যারাওরা ওখানে ছটফট্ করছেন।

হয়ত তাই। শ্রমিকদের অনাবৃত দেহগুলো সূর্য কিরণে চকচক্ করছে। তারাও যেন এক এক খণ্ড পাথর। হয়ত অতটা কালো নয়। আবার কেউ কেউ ঘন কৃষ্ণবর্ণের। তারা এসেছে দক্ষিণের দেশগুলো থেকে। অমন আসে অনেকে। ওই সব দেশে নাকি প্রায়ই আকাল হয়।

দেহরক্ষীদের দলপতি এসে জানায় যে প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে। অনখেসেন গাড়িতে ওঠার জন্য দুটি অতি ক্ষুদ্র ঢিবির মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ বালুকাময় পথ ধরে অগ্রসর হয়। কিছুটা পথ অতিক্রম করেই সে থমকে দাঁড়ায়। একটি রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে অনতিদূরে একটি পাথরের ওপর।

দলপতিকে প্রশ্ন করে—এর এই দশা কে করল ?

--ও আপনার মর্যাদা রাখেনি। অসম্মান করেছিল আপনাকে ?

—আমাকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

- আমাকে অসম্মান করল, অথচ আমি জানলাম না।

মৃতের মুখ দেখে সে স্তম্ভিত হয়। শ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র এই যুবকটির সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছিল। হোরেমহেবের প্রতি ঘৃণায় আর বিদ্বেষে তার মন ভরে ওঠে। আজীবন বিবাহ না করলেও হোরেমহেবের অঙ্কশায়িনী কখনো হবে না সে। বরং আগের সেই দেব-মহিষীর মত জীবন কাটিয়ে দেবে।

ক'দিন পরে অয় একদিন অনখেসেনের দর্শন প্রার্থী হয়। প্রাসাদে অয়-এর একটা বিশেষ স্থান আছে। অখেন-অটেনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিশ্বাসী

ছিল অয়। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুও বটে। সেই সঙ্গে প্রধান পরামর্শদাতা। শৈশব থেকে অয়কে অনখেসেন দেখে আসছে। অনেক আবদার করেছে তার কাছে। অনেক জ্বালাতন করেছে। অয়কে দেখলে স্নেহপ্রবণ বলে মনে হয়।

অয়কে বেশ গম্ভীর দেখায়। অনখেসেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলে—নিয়ম মাফিক সাক্ষাতের জন্য সে আজ আসেনি।

সে অয়কে বলে—আপনি আজকের মত অসময়ে আমার সঙ্গে কখনো দেখা করেন নি।

—কারণ রয়েছে।

অনখেসেন অয়-এর মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে। অয় চুপ করে থাকে। বোধহয় ভাবে, কি করে শুরু করবে।

শেষে বলে—আচ্ছা অনখেসেন, তুমি তো জন্ম থেকে এখানেই আছ। তোমার জন্মের দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। তোমার কি মনে হয় না, সব কিছু আগের মত ঠিক চলছে না। কোথাও কিছু যেন একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে?

—আমরা দেশের আর কতটুকু দেখতে পাই। এই প্রাসাদেই বরাবর থাকি।

—আমি দেশের কথা বলছি না। শুধু প্রাসাদের এই ভেতরটুকুর কথাই বলছি। তুমি তো একটা ঘরে আবদ্ধ থাক না। সর্বত্র ঘুরে বেড়াও। কিছু কি কখনো তোমার নজরে পড়ে না, যা তোমাকে চমকিত করে? কিংবা ধর কোন ফিস্‌ফিসানি?

—আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে না পারলেও আমার অনুভূতি সব সময় আমাকে শঙ্কিত করে রাখে। শঙ্কা আমার শৈশব থেকেই রয়েছে। তখন থেকেই মনে হয় মৃত্যু প্রাসাদের প্রতিটি মানুষকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কত সময় চমকে উঠেছি। পিতার মৃত্যুর পর থেকে সেই শঙ্কাভাব আরও বেড়ে গিয়েছে।

—ঠিক।

—কি ঠিক?

—তুমি ঠিক বলেছ।

—কোন বিষয়ে?

—ষড়যন্ত্র। একটা ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়ে উঠছে যেন।

অনখেসেন বলে—ষড়যন্ত্র কি এই প্রথম?

—না। কিন্তু এ আরও ভয়ানক। একটা বংশের অবলুপ্তি ঘটানোর ষড়যন্ত্র এটি।

—কি বলছেন আপনি!

—আমি তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে পারছি না। সময় হলে সব বলব। কিন্তু তুমি খুব সাবধানে থেকো।

—আমি? আমি কে?

—তুমি কে? এখন সেটা তোমাকে বলব না। তবে তুমি অনেক কিছু। বলতে গেলে, তুমি সব কিছু।

অনখেসেন মনে মনে ভাবে, মা নেফেরতিতিও বলতেন সে কথা। সে এবং তুতেনখটেন। কিন্তু অয়কে সে কথা বলা বোধহয় উচিত হবে না। অয়-এর দৃষ্টি-ভঙ্গি তার জানা নেই। সে হয়ত অন্যরকম কিছু ভাবছে।

সে বলে—আমার নিরাপত্তা কি আমার ওপর খুব একটা নির্ভর করে?

—নিশ্চয়। তুমি সদাসতর্ক থাকলে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পার। আমি যেটুকু সম্ভব নিশ্চয় দেখব।

—কিন্তু আপনার ভীতির এমন কি কারণ ঘটল? স্মেনখকরে দিব্যি রাজ্য শাসন করছেন। তিনি নীরোগ।

—জানি। তবু।

একটু বাজিয়ে দেখার জন্য সে অয়কে বলে—হোরেমহেব আমাকে বিবাহ করতে চায়।

লাফিয়ে ওঠে অয়। বলে—তোমাকে সে নিজে এসে বলেছে? এর মধ্যেই? জানতাম বলবে।

—আপনি জানতেন?

—হ্যাঁ। তোমাকে বিয়ে করতে পারলে ওর পথ মসৃন হয়ে যায়। তখন শুধু একটি বাধা, একটি মৃত্যুই যথেষ্ট।

—কোন্ মৃত্যু? কার মৃত্যু?

—সেকথা এখনই বলতে পারব না। কারণ আমি প্রমাণ করতে পারব না। তুমি সাবধানে থেকো অনখেনসন।

—স্মেনখকরের সহসা মৃত্যুর কথা ভাবছেন?

চমকিত হয়ে বলে—তুমি বুঝতে পেরেছ তাহলে?

—আমি অনেক আগে থেকেই জানি।

—কি করে জানলে?

—মা বলেছিলেন।

—ও।

—আপনাকে একটা কথা বলব ?

—নিশ্চয় বলবে। এখন থেকে আমাদের দুজনাকে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতে হবে।

—আপনি আমার মায়ের ফিরে আসার ব্যবস্থা করতে পারেন না ?

—নেফেরতিতির ?

—হ্যাঁ। বাবা মৃত। তাঁর আদেশ এখন বলবৎ থাকতে পারে না।

অয় একটু হেসে বলে—ফ্যারও কখনো মৃত হন না। দেহের পরিবর্তন ঘটে মাত্র। এক ফ্যারওর আদেশ পরবর্তী ফ্যারও বাতিল করতে পারেন বটে। কিন্তু কেন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে চাও ?

—মায়ের কাছে থাকব বলে। আমার জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ। তুতেনখটেন মায়ের সঙ্গে ফিরে আসবে।

—ছেলেটি বড় সুন্দর। তাকে দেখলে মায়া হতো।

—ঠিক বলেছেন। আমারও।

—কিন্তু তোমার মা এলেও তুতনখ-এর এখানে আসা ঠিক হবে না।

—কেন ? তার অপরাধ ?

—অপরাধ আছে বৈকি। সে ভূতপূর্ব অখেন-অটেনের ভ্রাতা। উভয়ের পিতাই অমেনোফিস। হোরেমহেব তাকে বরদাস্ত করবে না।

—কেন ? সে তো স্মেনখকরে নয়।

—একবার ভেবে দেখো ফ্যারও হওয়া তার পক্ষে কত সহজ।

অনখেসেন একটু চুপ করে থেকে বলে—আমি জানি আপনি কি বলতে চাইছেন। আপনি বলতে চাইছেন হোরেমহেব ষড়যন্ত্র আর মৃত্যুর মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করতে চায়।

—ঠিক।

—আজ আপনি প্রবীণ না হলে আমাকে বিয়ে করতে পারতেন। আপনার পথও সুগম হতে পারত। তাই না ?

—তুমি ভুল বুঝলে অনখেসেন। সিংহাসনের প্রতি ললুপতা অতটা আমার নেই। থাকলে তোমাকে বিয়ে করতে বাধা কোথায় ?

—আমি আপনার মেয়ের চেয়েও ছোট।

—কিছু এসে যায় না তাতে। তবে হোরেমহেবকে বাধা দিতে হলে যদি

তোমাকে বিয়ে করতে হয় আমি তাই করব।

—আমার নিজের মতামত নেই ?

—থাকলেও এসে যাবে না। ওকে রুখতে আমি বেপরোয়া হব।

—তাহলে দেখছি আপনারা দুজনেই সমান।

—না। আমি তোমাদের বংশের পতন ঘটাতে চাই না। হোরেমহেবের মনের ইচ্ছা তাই। আমার একমাত্র লক্ষ্য হোরেমহেব যেন সফল না হতে পারে।

—তার মতলব এতটাই স্পষ্ট আপনার কাছে ?

—হ্যাঁ। আমি অনেকদিন ধরে তাকে কড়া নজরে রেখেছি। তাই বুঝতে পারি। ভুলে যেও না অনখেসেন তোমার পিতামহের সময় থেকে আমি তোমাদের বংশের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছি। তখন আমি সবে যৌবনে পদার্পণ করেছিলাম।

—জানি। ছেলেবেলায় আপনি আমাদের স্নেহ করতেন, তাও বুঝতাম। তবু হিংসাকে যে আপনি প্রশয় দেন, নিজের অধিকার বজায় রাখতে নরহত্যায় যে আপনারও কোন অরুচি নেই, তাও জানি।

বিস্মিত অয় বলে—কি বললে ?

—যা বললাম, আপনি ভালভাবেই শুনেছেন।

—প্রকারান্তরে আমাকেও তুমি হত্যাকারী বলতে চাইছ।

—আমি জানি, আপনি যে হত্যাকারী, এ কথা মনে প্রাণে কখনো অস্বীকার করতে পারবেন না।

অয় অনেকক্ষণ অনখেসেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শেষে তার মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। সে মাথা ঝাঁকায়। ভাবে, হোরেমহেব তার সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু বলেছে অনখেসেনকে। বেচারা সেকথা বিশ্বাস করেছে।

—হোরেমহেবের কোন কথায় বিশ্বাস করো না। সে তোমার মন ভাঙাচ্ছে।

অনখেসেন নিজেকে সামলে নেয়। প্রাসাদে উপস্থিত মিত্র বলতে এখন মাত্র অয় রয়েছে। তাকে শত্রুতে পরিণত করা বিপজ্জনক হবে। বড় বোন মার্ত-এর প্রেমিককে কবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, সেকথা প্রকাশ না করাই ভাল। নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ হনন এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। এর চেয়ে আরও নৃশংস, আরও ভয়াবহ ঘটনা ঘটে নীলনদের অববাহিকায়।

অয়-এর কথায় সে হেসে বলে—হতে পারে। হোরেমহেব যথেষ্ট বলশালী পুরুষ। তার কথায় একটা আকর্ষণ আছে। সহজেই বিশ্বাস করে ফেলি। তার যৌবন আছে, সে মোটামুটি সুপুরুষ। সেই জন্যেই বোধহয়।

—না না, তার যৌবনে কখনো ভুলো না। সে সাংঘাতিক।

—আপনার উপদেশ মনে থাকবে।

অনখেসেনঅটেন ভালভাবেই জানে সম্রাজ্ঞী হলেও তার বোনের মনে কোন শান্তি নেই। শুধু পুরুষ পদবাচ্য একজন মানুষের সঙ্গে ঘর করা যায় না—ফ্যারও হলেও নয়। স্মেনখকরের ওপর দিনের পরে দিন ঘৃণা সঞ্চিত হতে থাকে তার মনে এ খবর অনখেসেন ভালরকম রাখে। একজন পুরুষের লোভ-লালসা সবই আছে, অথচ সে নারী সঙ্গ চায় না, এর চেয়ে ঘৃণিত আর কি থাকতে পারে? মার্ত ভাবে এটা তার নারীত্বের প্রতি চরম অবমাননা।

অনখেসেন একদিন কথার ছলে বড় বোনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেই দিনের কথা যেদিন স্মেনখকরে তার হাত ধরে খেজুর গাছের অন্তরালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কথাটা শুনে ক্ষেপে উঠেছিল মার্ত।

বলেছিল—সেদিন আমি ভুল বুঝেছিলাম। সেদিন আমাকে শুধু চুমু খেয়েছিল। আর কিছু নয়। অথচ কত সুযোগ ছিল। তুই আমাদের দেখেছিলি কোন সুযোগে। কিন্তু অন্য কোন জনপ্রাণীকে দেখতে পেয়েছিলি? তুই-ই বল।

ঘাড় নেড়ে অনখেসেন বলে—না।

—তবে? কত সুযোগ ছিল। কিন্তু শুধু জড়িয়ে ধরা আর চুমু খাওয়া। এখন ভাবলে লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়।

—কিন্তু সেদিন ফ্যারও নিশ্চয় অভিনয় করেন নি।

—আলবৎ করেছে। ওর ভয় ছিল আমাকে বিয়ে না করতে পারলে ফ্যারও হতে পারবে না।

—কেন? ও নিজেও তো অখেন-অটেনের পুত্র?

—তবু।

—একথার কোন যুক্তি নেই।

—আছে। অখেন-অটেন জানতে পেরেছিলেন ও সমকামী।

—কি বলছিস!

--হ্যাঁ। ও নিজে আমার কাছে কবুল করেছে। তাই আমার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করছিল। আর সেটা আমার কাছে কত গোপন বলে মনে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু প্রতিটি ঘটনায় সাক্ষী ছিল। পিতা নিজে সাক্ষী রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। উনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী পুরুষের প্রতি অদম্য মোহ থেকে সরে এসে নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছে কিনা। তখন এসব জানলে আত্মহত্যা করতাম।

অনখেসেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তার মুখ দিয়ে বাক্য নির্গত হয় না। ভাবে, বড় বোনের মত এমন ভাগ্যহীনা রমণী পৃথিবীতে বোধহয় খুব কমই আছে। ওর নিজের প্রেম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল যৌবনের প্রথম উন্মেষের সময়। সেই প্রেম বালি চাপা পড়েছে। তার পর ভেবেছিল জীবনে প্রেম না আসুক, অন্তত নারীর মর্যাদাটুকু সে পাবে। স্মেনখকরে সেই মর্যাদায় পদাঘাত করেছে। সমবেদনার কথা যোগায় না তার মুখে।

মার্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে—এবারে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিস রাণী হয়েও আমি কত সুখে আছি?

—বুঝেছি। তবু স্মেনখকরের স্বার্থের সঙ্গে তোর স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তার মঙ্গলে তোর কতটা মঙ্গল জানি না। তবে তার অমঙ্গলে তোর অমঙ্গল তো বটেই।

—কি রকম?

—খুব সোজা। তার জীবনহানি ঘটলে তুই আর সম্রাজ্ঞী থাকবি না। কোথায় গিয়ে পড়বি কোন স্থিরতা থাকবে না। কিংবা হয়ত কেউ ফ্যারও হবার লোভে তোকে জোর করে বিয়ে করবে।

মার্তের মুখে হাসি ফোটে। বলে—তেমন কোন পরিত্রাতা আছে কি এই মিশরে?

—আছে বৈকি?

—কে?

—সেনাধ্যক্ষ হোরেমহেব।

—আহা, অটেন যেন তাই করেন।

—কি বলছিস তুই? এতে আমাদের পিতৃ বংশ নষ্ট হবে।

—হোক। বয়ে গেল। আমার গর্ভের সন্তানের বংশ তো থাকবে।

—তুই বড় সর্বনাশা নারী।

—হ্যাঁ। কিন্তু সেটা আমার দোষ নয়। আমাকে অমন করা হয়েছে। আর করেছে আমার পিতৃবংশ। সেই বংশ নির্বংশ হলে আমার আনন্দই হবে।

অনখেসেন গম্ভীর হয়। তার তুতনখটেনের কথা মনে পড়ে। সে এই বংশেরই কিশোর। তার কোন অমঙ্গল হোক একথা মনেও স্থান দিতে চায় না সে।

মার্ত দুঃখের হাসি হেসে বলে—চুপ করে রইলি কেন। রাগ না দুঃখ?

—হোরেমহেব না হয়ে অন্য কেউ ও তোকে জোর করে বিয়ে করতে পারে। ফ্যারওর সিংহাসন বড়ই লোভনীয়।

—যেমন?

—যেমন অয়।

মার্ত দুঃখেও হেসে ফেলে—ওই বুড়ো।

—কেন, বুড়োদের লোভ থাকতে নেই?

—থাকবে না কেন? কিন্তু সে আমাকে নিয়ে কি করবে?

—সেকথা কি করে বলব?

—আমি তাতেও রাজি। আমার এই রাজ্ঞীর আসন অটল রেখে সবতাতেই আমি রাজী।

এবারে অনখেসেন রেগে যায়। সে বিদ্রূপ করে বলে—কিন্তু তোর যে রকম ভাগ্য অত সুখ সইবে না। স্মেনখকরেকে পদচ্যুত কিংবা অন্য কোন ভাবে সরিয়ে তোকেও বালির নীচে পুঁতে ফেলতে পারে।

—ভুলে যাস না অনখেসেন আমি তোর বোন হলেও সম্রাজ্ঞী। ওজন করে কথা বলিস।

—আমি মাফ চাইছি। এই ভয় দেখানো বা আদেশের ক্ষমতাটুকু যাতে তোর বজায় থাকে আমিও তাই চাই। আর সেই জন্যেই এসেছিলাম তোর কাছে। স্মেনখকরেকে যতই ঘৃণা করিস, তার জীবনহানি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

—আমার কি করার আছে? ফ্যারওর মন্ত্রী আছে, সেনাধ্যক্ষ আছে। তারা তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

হতাশ অনখেসেন বলে—এতক্ষণ তবে বললাম কি? যাদের ওপর ওর নিরাপত্তা রক্ষার ভার তারাই যদি ক্ষতি করতে চায়, তাহলে?

—তাহলে কি? আমি ওর নিরাপত্তা দেখব?

—দেখবি বৈকি। নেফেরতিতি দেখতেন তাঁর স্বামীর নিরাপত্তা।

—নেফেরতিতি ? যে তার সন্তানদের ভালবাসেনি কখনো ?

ভুল ধারণা। তাঁর মনে যথেষ্ট স্নেহ ছিল। কিন্তু বড় চাপা। তবু বলব, স্নেহশীলা রমণীর মত তিনি সত্যি ছিলেন না। তবে তারও কারণ আছে। তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন একদিন আমাকে। কিন্তু এখানে স্নেহের কথা বলছি না। তিনি আদর্শ সম্রাজ্ঞী ছিলেন, সেই কথাই বলতে চাইছি। তিনি তাঁর স্বামীর অপ্রকৃতিস্থতা বহুদিন সবার অগোচরে রাখতে পেরেছিলেন। স্বামীর কাছ থেকে সরে আসার পরই শুধু অখেন অটেন বে-আব্রু হয়ে পড়েন। নেফেরতিতি রাজ্যের সমস্ত ঘটনার কথা জানতেন। তিনি রাজনীতি বুঝতেন।

–এত কথা কোথায় শুনলি।

—তিনি নিজে থেকে আমাকে কিছু কিছু বলেছিলেন। তাছাড়া গোপনে একটা পত্র লিখে পাঠিয়েছেন।

স্তম্ভিত মার্ত বলে ওঠে—তোকে ?

—হ্যাঁ। কাকে আর লিখবেন ? সবাই তো বিরূপ।

–কেন আমি সম্রাজ্ঞী, আমাকে ?

—জানিনা। বোধহয় ভেবেছিলেন, আমাকে লিখলেই তুই জানবি।

—কি লিখেছেন ?

—প্রথমেই লিখেছেন, ফ্যারওকে সরাবার ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হচ্ছে।

আমরা প্রাসাদে বসে জানতে পারলাম না, আর উনি অত দূরে বসে জেনে ফেললেন ?

—ভুলে যাস্না উনিই ছিলেন সম্রাজ্ঞী। অনেক বিশ্বস্ত অনুচর ওঁর ছিল যারা অহরহ খবর এনে দিত। আজও তাদের কিছু কিছু তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত। হয়তো কোন উপকার করেছিলেন তাদের। তোরও নিশ্চয় অনুচর রয়েছে। তুই সম্রাজ্ঞী।

উষ্ণ কণ্ঠে মার্ত বলে –না।

সেকি। তুই যে একদিন বলেছিলি, তোর এখন অনেক চোখ।

—সে সব কথা থাক। আর কি লিখেছেন নেফেরতিতি ?

—লিখেছেন ফ্যারওকে বারবার বলতে, হোরেমহেব যেন কোন যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করে। নইলে সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। বসে থেকে থেকে তারা বিরক্ত। অন্য দেশে সমরাভিযানে গেলে তারা শান্ত হবে। পরাজিত দেশে লুণ্ঠন করে কিছু অর্থ উপার্জন করবে। দেশের শান্তি বজায় রাখতে কৌশল

হিসাবে এমন করতে হয় বলে মা লিখেছেন।

—আর ?

—আর লিখেছেন, সৈন্য চলাচল হলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও সচল হবে।

—এতই যখন জানতেন নেফেরতিতি সম্রাজ্ঞী থাকার সময় করেন নি কেন ?

—বাবার সঙ্গে তাঁর এই জন্যই বিরোধ। নইলে তুই তো শুনেছিস তিনি প্রথম জীবনে বাবাকে অনুসরণ করে অটেনকে বিশ্বাস করেছেন। তাঁর জন্যে অনেক মন্দিরও তৈরী করে দিয়েছেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারেন বাবা ঠিক সুস্থ মস্তিষ্কের ছিলেন না। তাঁর একগুঁয়েমীও রোগের অঙ্গ। তবু চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধাভিযানের জন্য। পারেন নি। ফ্যারওর পাগলামীর কাছে ধাক্কা খেয়েছে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা। বুঝলেন দেশ রসাতলে যেতে বসেছে। তখন শুধু ফ্যারওকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হন। এই জন্যে তিনি কন্যাদের কাছে তো বটেই এমন কি স্বামীর কাছেও অপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

মার্ত চুপ করে থাকে।

অনখেসেনও সহসা নীরব হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে তার ভগিনীর কাছে কিছু বলা অনর্থক। কোন ব্যাপারেই মার্তের আর আগ্রহ নেই। সম্রাজ্ঞী হয়েও সে জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না। সে স্বামীর ভালাবাসা পায়নি, স্বামীকেও সে ভালবাসতে পারেনি। তাই মিশরের ভাগ্য নিয়ে তার কোন চিন্তা নেই। এইখানেই মায়ের সঙ্গে তার পার্থক্য। স্বামীকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। মার্তের মধ্যে তার ছিটে ফোঁটাও নেই। তার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষার সামান্য অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। সেটি হলো, অন্য যে কোন পুরুষের পত্নী হয়েও যদি সে সম্রাজ্ঞী থাকতে পারে, তাতেও ক্ষতি নেই। হতাশাগ্রস্ত মার্ত তার মনুষ্যত্ব হারাতে বসেছে।

অনখেসেন একসময় উঠে দাঁড়ায়।

-উঠলি কেন ? আর একটু বোস।

—না, যাই।

—বুঝেছি, আমার সান্নিধ্য ভাল লাগছে না।

—ঠিক ধরেছিস। বেঁচে থেকেও তুই মরে গিয়েছিস।

মার্ত খিল খিল করে হেসে ওঠে। তার হাসির ধরনে চমকে ওঠে অনখেসেন।

হাসিটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। শেষ পর্যন্ত পিতার রোগ ওর মধ্যেও দেখা দিল নাকি ? অসম্ভব কিছু নয়।

সে ভগিনীর দিকে নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। তখনো শুনতে পায় সে, মিশরের সম্রাজ্ঞী হেসেই চলেছে।

ফ্যারও স্মেনখকরের দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে। রাজ চিকিৎসক পেপির অভিমত তাই। কোন রোগের বিরুদ্ধে যুঝবার ক্ষমতা নাকি তাঁর নেই। খবরটা গোপন। গোপনই থাকবে। তবে অনখেসেন জানল অয়-এর কাছ থেকে।

অয় গম্ভীর হয়ে বলে আসলে এটা প্রচার।

আপনি বলতে চান, ফ্যারও রোগগ্রস্থ নন ?

-তিনি অবশ্যই অসুস্থ। কিন্তু যা রটনা করা হচ্ছে অত্যন্ত কৌশলে সেটা আদৌ সত্য নয়।

—এ কথার অর্থ।

-আমি বেশ কয়েকবার হোরেমহেবকে ফ্যারওর ব্যক্তিগত চিকিৎসক পেপির সঙ্গে নিরিবিলিতে কথাবার্তা বলতে দেখেছি।

—তাতে কি প্রমাণ হয় যে সে চক্রান্ত করছে ?

—অবশ্যই হয়। কারণ এর আগে পেপির সঙ্গে কখনো তাকে কথা বলতে দেখা যায়নি। যেটুকু কথা আমিই বলে এসেছি বরাবর। প্রাসাদের কারও অসুখ হলে, আমার কাছেই আসত সে। অথচ খোদ ফ্যারও অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্গে কথা বলল না এ পর্যন্ত। ওর বাবাও চিকিৎসক ছিলেন। তিনিও আমার পরিচিত ছিলেন। তিনিও কখনো আমাকে অবহেলা করেন নি।

অবহেলা করাটা বড় কথা নয়। চিকিৎসাই মূল কথা। চিকিৎসার অবহেলা হচ্ছে কিনা সেটুকু দেখতে হবে।

—অবহেলা বলছি, এই জন্য যে ফ্যারও-এর মন্ত্রীত্ব তাঁর ধর্মবিষয়ক পরামর্শদাতা, তার সবকিছুর দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে চিরকাল। হোরেমহেব মাত্র সেদিন সেনাদলের ভার পেয়েছে। চিকিৎসার বিষয়ে তার কি ভূমিকা থাকতে পারে ? সেই জন্যই অবহেলার প্রশ্ন উঠেছে। চিকিৎসক আমাকে প্রাধান্য না দিয়ে ভুল করেছে। কারণ তাতে আমার সন্দেহ জেগেছে।

—আপনার কি সন্দেহ ?

—ফ্যারওকে খুব ধীরে ধীরে বিষ দেওয়া হচ্ছে হোরেমহেবের পরামর্শ অনুযায়ী। তার জন্য চিকিৎসক হোরেমহেবের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পাচ্ছে।

অয়-এর কথা শুনে অনখেসেনের বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। সে বলে—আপনার এত বুদ্ধি এত ক্ষমতা। বলতে গেলে দুই পুরুষ ধরে আপনি ফ্যারওর পরই সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি। আপনি কেন তবে নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন। আমি বলতে গেলে একজন অপরিণত বুদ্ধির নারী। আমার কাছে এসব কথা বললে কি ফ্যারওকে বাঁচানো যাবে ?

-না ! তবু বললাম। তোমার জেনে রাখা দরকার।

—স্মেনখকরেকে আপনি বাঁচাবেন না ?

--চেষ্টা করছি। আমি ভাবতে পারিনি, চিকিৎসক এমন অপদার্থ। প্রাসাদের আর কাকে কিনে রেখেছে হোরেমহেব কে জানে ?

বিরক্ত অনখেসেন বলে ওঠে—আসলে বয়স হয়েছে বলে আপনি একটু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। প্রৌঢ়ত্বের পরে শুনি মস্তিষ্কও অত সক্রিয় থাকে না।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অনখেসেনকে যেন দগ্ধ করতে চায়। পরে সামলে নিয়ে বলে- -পরে প্রমাণ পাবে। তখন আবার ঘটা করে ক্ষমা চেওনা যেন।

—আমি ক্ষমা চাওয়া পছন্দ করি না। অতটা নরম আমি নই। নিজেকে অত অসহায় ভাবি না। তবে আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মত দিন এলে খুশীই হব। শত হলেও আপনি আমার পিতামহের আমল থেকে রয়েছেন।

অয় হেসে বলে—আমি জানি তুমি সোজা মেয়ে নও। তাই ভয় হয় শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার সংঘাত না বাধে।

কেন বাধবে ? আপনার সঙ্গে তো আমার স্বার্থের সম্পর্ক নেই ?

-এখন নেই বটে। হতে কতক্ষণ ? আমার তো ধারণা একটা সম্পর্ক হতে চলেছে।

—সে কি ? আপনি কি আমাকে সত্য সত্যিই বিয়ে করার মতলব করছেন ?

অয় হেসে ওঠে। বলে -না। তবে তার কাছাকাছি কিছু। আমি চলি। অনেক কাজ। তুমি ঠিকই বলেছ। আগের মত আর তৎপর নই আমি। চিকিৎসকের এই ব্যবহারই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

স্মেনখকরের সত্যই মৃত্যু হল। ক'দিন থেকেই তার অবস্থা খুব খারাপ চলছিল। অনখেসেন তার শয্যাপার্শ্বে অনেকবার গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সব সময়

সে দুজন মানুষকে দেখেছে। একজন চিকিৎসক, যার ওখানে থাকা খুবই স্বাভাবিক। অপর জন হল হোরেমহেব। মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ মাখানো। অনখেসেন বুঝতে পারে না, ওই দুশ্চিন্তার একশো ভাগই কৃত্রিম কিনা।

অয়কে একবারও দেখেনি অনখেসেন। না দেখে রাগ হয়েছে তার। লোকটা কোথায় আছে? মার্তই বা কোথায়। তাকেও দেখা যায় নি কখনও। এবার কি হবে তার? এখন মিশর-দেশ ফ্যারও বিহীন। তবে স্মেনখকবের মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে অন্তত দুটি মাস সময় রয়েছে হাতে। এটাই সাধারণ নিয়ম। এর মধ্যে একজনকে ফ্যারও নির্বাচিত করতে হবে। কিন্তু কাকে? অয়-এর খোঁজ পাওয়া যায় না। তাকে প্রশ্ন করলে সদুত্তর পাওয়া যেতে পারত। এখনি তো তুতনখ-টেনের অভিষেক হওয়া উচিত।

স্মেনখকরের মৃত্যুর পরই কক্ষের বাইরে হোরেমহেব তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে —আমার একটি প্রার্থনা রয়েছে।

অনখেসেন অনুমান করতে পারে। তবু অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বলে —বলুন।

—আমি এখনো আপনার রূপের পিয়াসী। আপনার প্রেমের কাঙাল।

—কেন? অত ঘটা করে মুতনেজেমেতকে সাদি করলেন।

আপনি প্রত্যাখ্যান করলেন, ওদিকে সে কান্নাকাটি শুরু করল। কিন্তু আমার হৃদয়ে আপনার আসন চিরস্থায়ী। আপনিই হবেন সম্রাজ্ঞী। মুতনেজে-মেতের সেই যোগ্যতা নেই। যদিও সে আগের সম্রাজ্ঞী নেফেরতিতির ভগিনী।

—আপনি কি বলছেন? সম্রাজ্ঞী?

হ্যাঁ। শুধু আপনার সামান্য একটু অনুমতি। চিরকাল আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

-না।

হোরেমহেবের মুখ শুধু কঠিন হয়, হিংসা হয়ে ওঠে। সে স্থানত্যাগ করে দ্রুতপদে। সঙ্গে সঙ্গে অয় এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

অনখেসেন বিস্ময়াপন্ন হয়। এতদিনের মধ্যে একবারও অয়কে সে ফ্যারওর পাশে দেখেনি। মনে মনে রাগ ছিল। সে বলে—এবারে আপনার প্রস্তাব বুঝি?

—কিসের প্রস্তাব?

—আমাকে সম্রাজ্ঞী করার প্রস্তাব।

—হ্যাঁ, সেই জন্যই তো তোমার কাছে এলাম। আমি জানতাম হোরেমহেব তোমাকে হাত করার চেষ্টা করবে।

জ্বলে ওঠে অনখেসেন। বলে—আপনার লজ্জা করে না? এত বয়স হলো,

তবু একজন অল্পবয়সী মেয়েকে বিবাহের প্রলোভন ! ফ্যারও হবার সাধ !

—কে বলল একথা ?

—কেন, আপনি বললেন না এখুনি যে আমাকে সম্রাজ্ঞী করে দেবেন ?

—বললাম তো।

—তার অর্থ আমি বুঝি না। এতই বুদ্ধিহীন ভাবেন আমাকে ?

—ভাবতাম না এতদিন। এখন থেকে ভাবব ভাবছি।

—কি ভাবে আমাকে সম্রাজ্ঞী করবেন ?

—হোরেমহেব যেভাবে করতে চেয়েছে, সেইভাবে কখনই নয়।

—তবে ?

—তুতন্খটেনের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে। যদি তুমি রাজী হও।

—তুতন্খটেন ? সে কোথায় ?

—রাজধানীর পথে অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছে এতক্ষণে।

—অনখেসেনের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। সে ডাগর ডাগর চোখে চেয়ে থাকে বৃদ্ধের দিকে। এখন সে ভাল ভাবে লক্ষ্য করে দেখে বার্ধক্য অক্ষম করতে পারেনি অয় কে। তার দেহ সুদৃঢ়, তার চোখ দুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি। তার ওষ্ঠে অস্পষ্ট হাসির ছোঁয়া।

—নম্রকণ্ঠে অনখেসেন বলে—কখন খবর পাঠালেন ?

—কয়েকদিন আগে।

—স্মেনখকরে তখন তো জীবিত।

—কিন্তু জানতাম, তার মৃত্যু হবে। সঙ্গে সঙ্গে হোরেমহেবের তৎপরতা বাড়বে। তাই আগে থাকতে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

অনখেসেন হেসে বলে—আগে জানলে আপনাকে বিয়ে করতে রাজী হতাম।

— যাক, ঢের হয়েছে। বেশী বুদ্ধি ভাল নয়।

অনখেসেন অবাক হয়ে ভাবে, স্মেনখকরের মৃত্যুতে যতটা আঘাত পাবে বলে ভেবেছিল তার শতভাগের এক ভাগও পায়নি। মার্তের দুর্দশায় যতখানি দুঃখ পাবে বলে মনে হয়েছিল, তেমন কিছুই পেলনা। তবে কি সে নিজের স্বার্থটাই বড় করে দেখে মনে মনে ? সে-ও কি হোরেমহেবের মত আত্মসুখী। সে জানে, এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া বড় কঠিন। তবে সে যে বালুকাময় তপ্ত পৃথিবীর হীনতা ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে আদৌ নয়, একথা মনে প্রাণে স্বীকার করে।

সহসা মায়ের কথা মনে পড়ে যায় তার। তুতন আসছে, মা আসছে না ? তুতনের সঙ্গে মায়েরও তো আসা উচিত।

অয়কে প্রশ্ন করে—মা ! মা আসছেন না ?

অয় বলে—ওসব কথা পরে হবে। মনকে প্রস্তুত কর। সাবধানে থাক। মনে রেখ, তোমার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে সে-ও শত্রু।

—কেউ নেই তো ?

—এখন নেই, অন্য সময় থাকবে। হোরেমহেব কাঁচা নয়।

এতক্ষণ যেন মরু-ঝড় বইছিল। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রাসাদের সবাই উদ্‌ভ্রান্ত। সে নিজেও ব্যতিক্রম নয়। তবে সবার মুখের ওপর একটা অনিশ্চিতের ছাপ পড়েছে। সে জানে, তার মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। মায়ের কাছে এইটুকু শিখেছে সে। যাকে সে নিজের বলে ভাববে শুধু তার কাছেই তার মনের ভাব মুখের রেখায় স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে। অন্য কারও কাছে নয়। কিন্তু তেমন কি কাউকে পাবে সে জীবনে? তুতন্‌খটেনকে সে ভালবাসতে পারবে ঠিকই। তার ওপর প্রচণ্ড টান তার। কিন্তু সেই টান কি আত্মসমর্পণের পর্যায়ে পৌঁছোবে কোনদিন ? তাকে দেখলে যত্ন করতে ইচ্ছা করবে আদর করতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু তার সামনে নিজেকে মেলে ধরার নির্ভরতা কবে আসবে ? সে যে এখনো একান্তই কিশোর। তারপর যখন সেই দিন আসবে তখন কি আজকের আকুলতা ততটা থাকবে ? জানে না সে। এখন ওসব ভাবার সময়ও হয়নি। এখন শুধু প্রার্থনা করার সময়, যাতে তুতন নিরাপদে এসে পৌঁছোতে পারে, যাতে তাদের মধ্যে বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হয়, যাতে তুতন ফ্যারও রূপে অভিষিক্ত হতে পারে। অনেক যোজন পথ এখনো বাকী।

এবারে অনখেসেনের মনে হয়, বড় বোনের কাছে একবার যাওয়া উচিত। মন থেকে সায় দেয়নি। কারণ মার্ত-এর মনের খবর তার অজানা নয়। স্মেনখকরের মৃত্যুতে তার বিন্দুমাত্র দুঃখ হয়নি। কিন্তু একথা তো সত্য যে সে তার সম্মানের আসন থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল। সে আর সম্রাজ্ঞী নয়—ক্ষমতার অধিকারিণীও রইল না। একথা ভেবে নিশ্চয় আফশোষ হচ্ছে তার। কতটুকু আফশোষ হচ্ছে সেটুকু দেখার জন্য মার্তের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করে।

সে দেখে মার্ত একটুকরো মাংসের হাড় চুষতে চুষতে ঘরময় পায়চারী করছে। সেই টুকরো বোধহয় চোষা শেষ হয়েছিল। তাই সেটিকে ঘরের একদিকের দেয়ালের গায়ে সশব্দে ছুঁড়ে ফেলে একটি সিংহ-মুখী সুদৃশ্য টেবিলের ওপর রাখা রেকাবি থেকে, আর এক টুকরো তুলে নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে কামড় দেয়। অনখেসেনের প্রবেশের দিকে তার লক্ষ্য নেই।

মার্তকে কখনো এত একাগ্রভাবে মাংস ভক্ষণ করতে দেখেনি সে। ক্ষুধার্ত

অবস্থাতেও খাদ্য দ্রব্যের প্রতি উদগ্র লালসা তার কখনো ছিল না। বরং সে খাওয়ার ব্যাপারে বরাবর একটু বেশীমাত্রায় নির্লিপ্ত। ক্ষুধামান্দ্য ছিল বরাবর। অথচ আজ এ কি দেখছে সে? তবে কি তাকে খেতে দেওয়া হয়নি? কিন্তু তাহলে তো সে নিজেই চেয়ে নিতে পারত।

—মার্ত।

মার্ত চমকে ওঠে। তার হাত থেকে নতুন টুকরোটি খসে পড়ে মেঝেতে। সে তাড়াতাড়ি অদূরের শয্যার ওপর থেকে একটি অতি মূল্যবান তোয়ালে তুলে নিয়ে দুহাত মুছে ফেলে সেই তোয়ালে মাংসের রেকাবির ওপর চাপা দেয়।

—আমি কিছু খাই নি। ভাবছিলাম। অনেক কথা ভাবছিলাম।

মার্ত-এর কৈফিয়ৎ শুনে অনখেসেনের বুক কেঁপে ওঠে। বুঝতে পারে মার্ত ভীষণ ভয় পেয়েছে। বোধহয় ফ্যারওর মৃত্যু এর কারণ।

তোর কি হয়েছে মার্ত?

মার্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে ভগিনীর দিকে। তারপর হেসে বলে কিছু হয় নি। কিছু খাই নি। ভাবছিলাম।

—কি ভাবছিলি?

ভাবছিলাম পেপি যতটা ওষুধ দিয়েছে সব খেয়েছি তো?

প্রাসাদের চিকিৎসকের নাম পেপি। তার সঙ্গেই হোরেমহেবকে কয়েকবার কথা বলতে দেখেছে অয়।

—পেপি কী ওষুধ দিয়েছে? কেন? কি হয়েছে তোর?

বারে, আমার ঘুম পায় না, খিদে হয় না। তাই।

—পেপি কবে থেকে ওষুধ দিচ্ছে?

—অনেক দিন। স্মেনখকরেকে দিত, আমাকেও দেয়।

—কখনো বলিস নি তো?

—নিষেধ ছিল। তোরা তো সব আমার শত্রু। রাণী হতে চাস।

অনখেসেন বুঝতে পারে তার জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রকৃতিস্থ নয়। এটা সাময়িক কিংবা চিরস্থায়ী বোঝার উপায় নেই। তবে হোরেমহেব এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছে। এবারে বোধহয় তার পালা। অয়কে খবরটা দিতে হবে। তার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সে সাহায্য করবে আপাতত। কারণ হোরেমহেব তারও শত্রু। কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার।

অনখেসেন রেকাবির ওপর থেকে তোয়ালে তুলতে গেলে মার্ত ছুটে এসে হাত চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে—ছেড়ে দে বলছি। তুই আমার মাংসে বিষ মিশিয়ে

দিবি। আমি জানি।

—মেশাব না।

—আলবৎ মেশাবি। পেপি বলেছে।

—বেশ। আমি হাত দেব না। ফ্যারও কোথায় ?

কথাটা শুনে মার্তের মধ্যে কোনরকম বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সে অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলে সাজানো হচ্ছে।

সমাধিস্থ করার আগে শবদেহের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী করার জন্য নানান রকম তেল আরক ইত্যাদি দ্বারা সিক্ত করা হয়। নানান কিছু দেহে লেপন করা হয়। বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করা হয়। কিন্তু মার্তের কথা শুনে তেমন কিছু মনে হলো না।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে সে প্রশ্ন করে সাজানো হচ্ছে কেন ?

নীলকান্ত মনি আনতে যাবে। যুদ্ধ করবে।

এতক্ষণে নিঃসংশয় হয় অনখেসেন, যে মার্ত একেবারে অপ্রকৃতিস্থ। এখনি অয়কে কথাটা বলতে হবে।

সে ঘর থেকে বাইরে যাবার উপক্রম করতে মার্ত ছুটে এসে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে। বলে আমার ভয় করছে। চলে যাস্ নে।

—কিসের ভয় ? কাকে ভয় ?

—জানি না। চারদিকে শুধু ছায়া ফিস্‌ফিস্ কথা।

—এ আর নতুন কি ? আমি বহুদিন থেকে দেখি আর শুনি।

—তুই তোয়ালে তুলে মাংস দেখ, আমি কিছু বলব না।

—না। তুই বরং দরজা বন্ধ করে রাখ। কাউকে ঢুকতে দিবিনা। তোর দেখা-শোনার মেয়েরা কোথায় ?

—জানি না।

—সে কি ? এখনো স্মেনখকরেকে সমাধিস্থ করা হয় নি, এখনো তুই সম্রাজ্ঞী। কে সরিয়ে নিল ওদের ?

—আমি তো চিরকালই সম্রাজ্ঞী। নেফেরতিতি আর ফিরে আসবে না। আমার একটা ছেলে থাকলে বেশ হতো। সে ফ্যারও হতো। তাকে বুকে নিয়ে শুয়ে ঘুমোতাম। জানিস, এই বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে। মনে হয় অটেন দেবতা ভেতরে ঢুকে বসে আছেন। দাউ দাউ, দাউ দাউ—অসহ্য।

বুক চেপে ধরে মার্ত ছট্‌ফট করে। তারপর ছুটে যায় তোয়ালে-ঢাকা মাংসের কাছে। তোয়ালে তুলে এক টুকরো মুখে দিয়ে বলে—খাবি ?

—না।

অনখেসেন বাইরে চলে আসে। এবারে মার্ত ভ্রুক্ষেপও করে না। সে আপ মনে মাংস চিবোতে থাকে।

পরদিনই খবর রটলো যে সম্রাজ্ঞী উধাও। তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। অনখেসেন বুঝল চক্রীরা ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে আনছে। সেই জালের মধ্যে তাকেও ধরার চেষ্টা করবে। কিন্তু কিছুতেই সে তা হতে দেবে না। ধরা পড়লেও কেটে বেরিয়ে আসবে। হোরেমহেব যত বড় ধুরন্ধর হোক না কেন সেও রাজনীতি শিখে ফেলেছে।

কিন্তু অয়-এর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাসাদে এত ঘটনা ঘটে গেল। তবু সে নেই। মার্ত-এর জন্যে একটু অনুকম্পা হয় মাত্র অনখেসেনের। অথচ দুঃখে ভেঙে পড়ার কথা। শত হলেও একই মাতৃগর্ভে জন্ম তাদের। শৈশবে একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। তবু তেমন কিছু হলো না। তার উদ্বেগ এখন কেন্দ্রীভূত হয়েছে তুতনখটেনকে ঘিরে। হয়ত তাকে অবলম্বন করে সে নিজে সম্রাজ্ঞী হবে বলে।

সন্ধ্যায় অয়-এর সাক্ষাৎ মেলে।

—আপনি কোথায় ছিলেন। আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

তুতনখটেন পরশু এসে পৌঁছোবে। কাউকে বলো না।

—কিন্তু মার্তের খবর শুনেছেন?

আমি জানতাম এমন হবে।

—তাকে বাঁচাতে পারতেন না!

—হয়ত পারতাম, চেষ্টা করিনি। কারণ তার দিকে ওদের যতটা মন থাকবে তুমি থাকবে ততটা নিরাপদ। এখন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা আমার প্রধান কর্তব্য।

—কর্তব্য কেন?

—আমি চাই ফ্যারও বংশের পরিবর্তন যেন না ঘটে। আমি এই বংশের কাছে ঋণী।

—ও। কিন্তু আপনি নেফেরতিতির কথা একবারও বলছেন না। আমি

কি ধরে নেব এখনো তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে ? আমি মায়ের দেখা পাব না ?

—আমি ইচ্ছে করে তার কথা তোমাকে বলিনি। কোন নিষেধাজ্ঞা, কোন আইন তাঁকে আর বাঁধতে পারবে না।

অনখেসেন খুশী হয়ে বলে—তিনি তুতনখটেনের সঙ্গে আসছেন তাহলে ?

—না, তোমাকে বললে ভেঙে পড়বে বলে প্রথম দিন বলিনি। কিছুদিন আগে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অনখেসেন কান্নায় ভেঙে পড়ে। বুকের ভেতরে তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করে। মাকে সে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল। মায়ের ওই বাহ্যিক কঠিন আবরণের অন্তরালে সে আসল মানুষটির সন্ধান পেয়েছিল। সে জানত মায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর অসামান্য রূপ মানুষকে কাছে টেনেও দূরে সরিয়ে রাখত। একটা আবেষ্টনী সৃষ্টি করে রাখত তাঁর চারদিকে।

—কি হয়েছিল ?

—সঠিক জানি না। হোরেমহেবের হাত কি অতটা দীর্ঘ হয়েছিল ? বোধহয় না। আমারও লোক রয়েছে ওখানে। তারা তুতনখ আর তাঁর চারদিকে নিরাপত্তার বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে রাখত। বোধহয় এটা নিছকই দুর্ঘটনা। কিন্তু এভাবে ভেঙে পড়ো না। এখনই জীবনে তোমার সব চেয়ে শক্ত ও ঋজু হয়ে থাকার সময় অশ্রুজলকে আগুনে পরিণত কর।

অনেকক্ষণ পরে অনখেসেন বলে—মার্তকে বোধহয় পাগল করে দেওয়া হচ্ছিল।

—সম্ভব বৈকি।

—তার খাদ্যে কিছু মেশানো হতো। কোন নেশার জিনিষ। সে বুভুক্ষুর মত খাচ্ছিল। অথচ কোন খাবারেই তার কখনো আগ্রহ দেখতাম না আগে।

—হুঁ। তোমার খাবার কে আনে ?

—আমার নিজের লোক। বিশ্বস্ত।

—লক্ষ্য রেখো। তোমার প্রহরী ?

—মায়ের সময়ের মেয়েরা।

—সেকথা জানি। তারা এখনো বিশ্বস্ত তো ?

—প্রমান চান ?

অনখেসেন একজন নারী রক্ষীকে ইঙ্গিতে ডাকে। সে কাছে এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালে অনখেসেন বলে—এই মাত্র খবর পেলাম মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

মেয়েটি বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে ওঠে। নয়ন দ্বারা অশ্রু প্লাবিত হয়। সে চিৎকার করে কাঁদতে পারে না, ছুটে চলে যেতে পারে না। তার মুখ রক্ত শূন্য হয়ে যায়।

অনখেসেন তাকে ধরে বলে—এখানে বসো। কিছু হবে না।

অনুমতি পেয়ে বসে পড়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

—দেখলেন তো। আমি আর মাকে কতটুকু ভাল বেসেছি।

অয় মাথা ঝাঁকিয়ে স্থান ত্যাগ করে।

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই তুতনখটেন এসে উপস্থিত হল রাজধানীতে। অয় বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছিল। রাজপথ ধরে শোভাযাত্রা করে এল তুতনখটেন। সঙ্গে অনেক দেহরক্ষী। অভ্যর্থনাও করা হল জাঁকজমকের সঙ্গে।

খবর পেয়ে সেনাধ্যক্ষ হোরেমহেব ছুটতে ছুটতে এসে সব কিছু দেখে থ হয়ে যায়। অয়-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে শুকনো হাসি হেসে বলে—বেশ ভালই ব্যবস্থা করেছেন দেখছি।

অয় প্রত্যুত্তরে বলে—আমি জানতাম আপনার মত সমজদার ব্যক্তি এর তারিফ করবেন।

—আপনাকে তারিফ করতে হয়, সবটা গোপন রাখতে পেরেছিলেন বলে।

—কূটনীতির নিয়মই তাই। ঢক্কা নিনাদ করে সমরাঙ্গণে যাবার নিয়ম। কূটনীতিতে ও সব চলে না।

—ঠিক তাই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত নিয়মও দেখা যায়।

—যায় বৈকি। তবে কদাচিৎ।

তাহলে কূটনীতির পরবর্তী অধ্যায় কি হবে?

অয় জানে সৈন্যদলের অধিপতি হলেও হোরেমহেব ফ্যারওর বংশের কারও বিরুদ্ধে সেনাদের প্ররোচিত করতে পারবে না। তাদের বরাবরের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে ফ্যারও যেমনই হোন তিনি দেবতার প্রতিনিধি। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যায় না। যদি এই ধারণা সাধারণ মানুষের না থাকত, তাহলে অখেন অটেনের রাজত্বকালে চূড়ান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁকে উৎখাত করত তারা।

কারণ অখেন-অটেন তাদের ধর্ম বিশ্বাসে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হেনেছিলেন। তবু তারা সহ্য করেছে।

সাধারণ মানুষের মজ্জাগত এই মানসিকতাই অয়-এর সম্বল, তার শক্তি। সে জানত তুতনখটেনকে একবার নিয়ে আসতে পারলে নির্বিঘ্নেই তাকে ফ্যারও করা সম্ভব হবে।

হোরেমহেবের প্রশ্নের উত্তরে অয় বলে, পরবর্তী অধ্যায় তো খুবই সরল।

—যেমন ?

—তুতনখটেনকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হবে।

—আর রাণী ?

কেন, অনখেসেন অটেন।

- হুঁ। তুতনখ একান্তই নাবালক।

হ্যাঁ, তার বার্ধক্য আসতে অনেক বছর বাকি। ততদিনে আমার জীবিত থাকার প্রশ্নই ওঠে না, আপনিও অশক্ত হয়ে পড়বেন। আমাদের দুজনার স্থানই অন্যেরা দখল করবে। দুজনাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

—আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনার কথা আলাদা। কিন্তু আমি এখনো বহু বছর চন্দ্র-সূর্যের উদয় আর অস্ত দেখব। নীলনদ দিয়ে অনেক- অনেক জলরাশি বয়ে যেতে দেখব। এই তো সবে শুরু।

অটেন দেবতা, আপনার সহায় হোন।

দেবতা সবলেরই সহায় হন। দুর্বলের নয়।

আর বুদ্ধিমানেরও।

প্রাসাদে পা দিয়েই তুতনখটেন অনখেসেনকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার অনখেসেন এক অজ্ঞাত কক্ষে গিয়ে আত্মগোপন করে। পৃথিবীর যাবতীয় লজ্জা যেন তাকে পেয়ে বসে অথচ এর কোন অর্থ নেই সে জানে। যার জন্যে এত লজ্জা সে এখনো কিশোর। তবু কাটিয়ে উঠতে পারে না অনখেসেন এই লজ্জা। সে জানে তুতনখ মনে কষ্ট পাবে। কত উৎসাহ নিয়ে এসেছে সে। নেফেরতিতিকে হারাবার বেদনা তার চাইতে কাউকে বেশী স্পর্শ করেনি। গর্ভধারিণী না হয়েও নেফেরতিতি তার কাছে মায়ের চেয়েও বেশী ছিলেন। বলতে গেলে একমাত্র অবলম্বন। সে অবলম্বন হারিয়ে এখানে এসে সে অনখেসেনের কাছে আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ কিছুতেই সহজ হতে পারছে না অনখেসেন।

তুতনখ তাকে খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হয়। সে বুঝতে পারে না কি করবে। প্রাসাদে কোন কক্ষে আগে সে ছিল, ভুলে গিয়েছে। এখন কোথায় থাকবে তাও

অজানা। সে লক্ষ্য করে, তার দিকে সবার দৃষ্টি। সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত।

সে অয়কে বলে—অনখেসেন কোথায়? তাকে তো খুঁজে পাচ্ছি না?

অয় চমকে ওঠে—সেকি! সকালেই তো দেখেছি। নিশ্চয় কোথাও আছে।

তুতনখ-এর মুখ ভার হয়। বলে—না, নেই। আমি অনেক খুঁজেছি।

অয় এবার একটু ভীত হয়। হোরেমহেব কোনকিছু করল নাকি। উঁহু প্রাসাদে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেছে বেছে লোক রাখা হয়েছে। তুতনখকে এখানে আনার প্রস্তুতি চলেছে বহুদিন ধরে। হোরেমহেব সন্দেহ করতে পারে নি। কারণ স্মেনখকরে আর মার্ত-এর প্রহরীদের বদলি করা হয়নি তখন। কিন্তু স্মেনখকরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতেও হোরেমহেব সন্দেহ করেনি। কারণ এটা স্বাভাবিক।

প্রহরীদের প্রশ্ন করায় তারা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। একজন শুধু বলে—উনি বাইরে যান নি। ভেতরেই রয়েছেন।

অয় তখন একজন একদা নারী রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করে। সে একটু দ্বিধাগ্রস্থ কণ্ঠে বলে—ভেতরে আছেন।

—কি করছে।

—কিছু না। বসে আছেন।

—বসে আছে?

অয় ভাবে, হোরেমহেব নতুন কোন চাল চেলেছে নাকি এর মধ্যে। বলেছে নাকি, তুতনখ তার রূপের কদর দিতে পারবে না—সেই বয়স হয়নি। শত হলেও মেয়েদের মন? অস্থির মতি—অল্প প্রলোভনেই ফাঁদে পড়ে যায়।

তুতনখ নারী প্রহরীকে বলে—আমাকে নিয়ে চল।

—উনি বোধহয় রাগ করবেন।

—কেন?

—মনে হলো, লুকিয়ে আছেন।

—কেন?

—জানি না।

—আমাকে নিয়ে চল।

নারীরক্ষীর দ্বিধা যায় না। সে ইতস্তত করে। অয় তখন তাকে বলে—তুমি ভাবী ফ্যারওর অবাধ্য হচ্ছ।

যারা ছিল সবাই স্তম্ভিত হয়। তুতনখকে ঘটা করে অভ্যর্থনার বহর দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু আসল খবরটি প্রাসাদের ভেতরে কেউ পৌঁছে

দেয়নি। কারণ বাইরে যারা ছিল তারা সবাই হোরেমহেবের কেনা নোকর। এবারে তারা নতুন দৃষ্টিতে তুতনখ-এর দিকে চায়। এঁকে শৈশবে দেখেছেএমন কিছু কিছু নারীরক্ষী এখনো রয়েছে। এবং দেবশিশু সুলভ চেহারার একটা আকর্ষণ রয়েছে। যে সব শিশুকে দেখলে আদর করতে ইচ্ছা হয়, স্নেহ উথলে ওঠে, তুতনখকে শৈশবে দেখতে তেমনই ছিল। এখন তিনি একটু বড় হয়েছেন, কিন্তু তার সৌকুমার্য একটুকুও হ্রাস পায় নি। উনি পরবর্তী ফ্যারও, একথা জেনে তাদের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তারা আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায়।

নারী রক্ষীর সঙ্গে তুতনখ সেই কক্ষের দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়।

এখানে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি যাও।

এতদিন পরে দেখা হবে ভেবে তুতনখ-এর ভেতরে চাপা উত্তেজনা। সেই সঙ্গে আবার সংশয়। কেন তার কাছে না গিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখল অনখেসেন। বোধহয় তাকে ভুলে গিয়েছে। কিংবা তাকে আগের মত আর ভালবাসে না। বাসলে যখন তাকে প্রাসাদে অভ্যর্থনা করা হল, তখন উপস্থিত থাকত। ও যদি তাকে ভাল না বাসে তাহলে আবার থীবস্-এ ফিরে যাবে। দরকার নেই ফ্যারও হয়ে। কি হবে ? নেফেরতিতি চলে গেলেন, ও সরে যাচ্ছে। বেঁচে থেকে লাভ কি ?

সে দূরে অনখেসেনকে দেখতে পায়। কক্ষের অপর প্রান্তে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে বাইরের দিকে মুখ করে। ওকে দেখতে আগের মতই রয়েছে। ওর গায়ে কোন ধরণের সুঘ্রাণ—সেকথা বহুদিন পরে মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনটা উতলা হয়ে ওঠে।

সে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—আমি এসেছি। অনখেসেনের সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায়। সে দুচোখ মেলে ভালভাবে তাকায় তুতনখ-এর দিকে।

তুতনখ বলে—আমি ফ্যারও হবনা, আবার চলে যাব।

—কেন ?

তুমি আমাকে চাও না এখানে। আমি বুঝতে পেরেছি।

অনখেসেন দু'বাহু বাড়িয়ে তুতনখ-কে জড়িয়ে ধরে। সে বলে—কে বলল একথা।

—তুমি লুকিয়ে আছ কেন ?

—বললে, বুঝবে না তুমি।

—বুঝব। বল।

—লজ্জায়।

ততক্ষণে অনখেসেনের দেহের সেই পরিচিত ঘ্রাণ তুতেনখ-এর অভিমানকে গলিয়ে দিয়েছে। সে বলে—কিসের লজ্জা।

—কিসের আবার। তুমি দেখতে আরও সুন্দর হয়েছ। যত বড় হবে তত সুন্দর হবে।

তুমি আমাকে ভোলাচ্ছ।

—তোমাকে? তোমাকে কি ভোলাব! তুমি তো চিরকাল ভুলেই আছ।

—না। কাকে দেখে তোমার লজ্জা বললে না।

—তোমাকে। হল তো?

তুতেনখ ভাবে, নিশ্চয় অনখেসেন মজা করছে তার সঙ্গে। সে বলে—আজ যদি মা আসত সঙ্গে, তাহলে তুমি অমন দূরে চলে যেতে না।

এবারে অনখেসেন আর স্থির থাকতে পারে না। তার দুচোখ প্লাবিত করে অশ্রুজল। ঝাপসা চোখে সে তুতেনখ-এর গালের সঙ্গে গাল ঠেকায়। তুতেনখ-এর গালও ভিজে যায়। তবু তার ভাল লাগে।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটে। শেষে অনখেসেন বলে মায়ের কি হয়েছিল।

—জানি না। শুধু তার রক্তাক্ত দেহ দেখেছি। সবাই বলল, পড়ে গিয়েছিলেন।

—কি ভাবে।

—জানি না।

—হত্যা।

—কি বললে?

—তুমি ফ্যারও হলে প্রতিশোধ নিও।

—কার ওপর?

—খুঁজে বের করবে। মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে।

—অমন করো না। শান্তি পাবে না।

—কে বলেছে তোমাকে একথা?

—নেফেরতিতি। তিনি বলতেন, সব কিছুর মধ্যে কুটিলতা দেখতে দেখতে মন কুটিল হয়ে যায়। অন্যের পাপের খোঁজ করতে করতে নিজেই পাপী হয়ে যেতে

হয়। তার চেয়ে পৃথিবীর ভালটুকু দেখাই ভাল তুতনখ। তাতেই শান্তি।

—একথা তিনি বলতে পেরেছিলেন নির্বাসনে যাবার পরে। রাণী থাকার সময়ে নয়। তুমি কুটিল হও আমি মনেপ্রাণে চাই না। তোমার প্রতিশোধস্পৃহা থাকুক তাও চাইনা। তুমি যেমন আছ তাতেই আমার সবচেয়ে আনন্দ। কিন্তু ফ্যারওর ভূমিকা বড়ই জটিল। যাক্‌গে আজ আর ওসব কথা বলতে ভাল লাগছে না। আজ তোমাকে পেয়েছি বহুদিন পরে।

অনখেসেন বুঝতে পারে তুতনখ আরও লম্বা হয়েছে বটে তবু দেহ-মনে এখনো সে অপরিণত। তার প্রেমের আস্বাদ পেতে হলে আরও অপেক্ষা করতে হবে। তাই করবে সে। তুতনখ তার নিজের মত চলুক। সে নেফেরতিতির ভূমিকা নেবে। তুতনখ-এর চারদিকে নিশ্চিন্ততার আবেষ্টনী সৃষ্টি করবে। মার্ত সম্রাজ্ঞী হয়েও যথাযথভাবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি। মার্ত যে সম্রাজ্ঞী একথা কারও মনের মধ্যে গেঁথে দিতে পারে নি। সে কিন্তু অমন হবে না। সে সম্রাজ্ঞী হলে অয় এবং হোরেমহেবও বুঝতে পারবে মিশরের ফ্যারও কারও হাতের পুতুল নয়। তাঁকে ইচ্ছা মত চালনা করা যায় না। তার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে হয়।

কক্ষের বাইরে পদচারণার শব্দ শোনা যায়। অনখেসেন বুঝতে পারে, তারা দু'জন এতক্ষণ একলা এখানে আছে বলে অয় ব্যস্ত হয়েছে।

—চল তুতনখ বাইরে যাই। তোমাকে দেখার জন্য সবাই ব্যগ্র।

রাজ্যাভিষেকের পরে তুতনখ হলেন মিশরের নতুন ফ্যারও। স্মেনখকরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তিনি এখন শান্তিতে চিরনিদ্রায় অভিভূত তাঁর নতুন আলয়ে। কেউ সেখানে তাঁর নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাতে যাবে না। পিতা অখেন-অটেন যেকোন কারণেই হোক তাঁকে বড় বেশী প্রশ্রয় দিতেন। তাই পিতার শবদেহের পাশাপাশিই তাঁকে রাখা হয়েছে। অটেন দেবতা তাঁর পুত্র এবং পৌত্রের শান্তির দিকে নিশ্চয় নজর রাখবেন।

প্রজারা খুশী। নতুন ফ্যারওর চেহারার আকর্ষণ বড় বেশী। বয়স্কা রমণীরা তাঁর মধ্যে দেখতে পায় আদর্শ সন্তানের প্রতিরূপ। আহা, এমন পুত্রের জন্মদাত্রী হওয়া মহাভাগ্যের। সম্রাজ্ঞী টি'র পক্ষেই এমন পুত্রের জন্ম দেওয়া সম্ভব।

অল্পবয়সী যুবতীরা আবার অন্য কথা ভাবে। তাদের কল্পনা অন্যরকমের। ভাবে, কিশোর বয়সেই এই রূপ—দু-তিন বছরের মধ্যে এ এক অসাধারণ যুবক হয়ে উঠবে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী অনখেসেন এই ক'বছর কি করবেন? রূপসুধা পান করে কি তৃপ্ত হবেন? তবে তিনি জানেন, তাঁর ভবিষ্যৎ অতিরিক্ত সম্ভাবনাময়।

অয় এবং হোরেমহেব প্রথম প্রথম তুতনখকে নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী চালনা করার চেষ্টা করেছিল। অনখেসেন বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করল তার স্বামী বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সেই ব্যক্তিত্ব রূঢ় নয়, বরং আনন্দদায়ক। অয় এবং হোরেমহেবের কোন কথা তুতনখ-এর পছন্দ না হলে তিনি খুবই সুমিষ্ট ভাষায় যুক্তি দেখিয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ওরা দু'জন মনে মনে হয়ত অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। একদিন ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, অমেনফিসের চেয়েও বুদ্ধিমান হবে এই ফ্যারও।

অনখেসেন অয় আর হোরেমহেবের হাবভাব লক্ষ্য করে আনন্দিত হয়। সে তার স্বামীর জন্য গর্ব অনুভব করে। তাই একদিন অকারণে চুম্বনে চুম্বনে স্বামীর গাল ভরিয়ে দেয়।

—একি করছ!

—কেন, করতে নেই?

—তা কেন? কিন্তু হঠাৎ এত বার।

—ইচ্ছে হল, তাই। আচ্ছা, তুমি কার?

তুতনখ একটু ভেবে বলে—মিশরের।

—কি বললে? তোমার জন্যে আমি দিনের পর দিন দগ্ধে মরছি, আর তুমি বললে কিনা তুমি মিশরের। যাও তোমার সঙ্গে কোন কথা বলব না আজ থেকে।

তুতনখ-এর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে অনখেসেনকে বাঁ হাত দিয়ে বেষ্টন করে, ডান হাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরে কাতর দৃষ্টিতে বলে—তুমি যে আমাকে বলেছিলে আমি সমস্ত মিশরের।

অনখেসেন এক ঝলক স্বামীর চোখ দুটোর দিকে চায়। স্বামীর কাতর চাহনিতে তার হৃদয় গলে যেতে চায়। তবু সে বলে—তাই বলে তুমি আমার কেউ নও?

—কে বলল একথা? তুমি এমন কথা বলছ কেন?

—সবচেয়ে আগে তুমি আমার। বল তাই কিনা।

—হ্যাঁ, সেকথা তো জানি, কিন্তু—

—কোন কিন্তু নয়। তুমি শুধু আমার।

খুব ভাল। চল না, আমরা কোথাও চলে যাই। এই ফ্যারও হওয়া আমার ভাল লাগে না।

—এ আবার কি কথা? তুমি ফ্যারও না থাকলে আমি সম্রাজ্ঞী রইব কি করে?

—তাও তো বটে। ঠিক আছে তুমি সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকো। আমি ফ্যারও না থাকলে চলে না?

—না।

—তাহলে আমি ফ্যারও থাকব। সব গোলমাল হয়ে গেল। তুমি এত ভয় পাইয়ে দাও। তোমার রাগ দেখলে আমার ভয় হয়।

—তুমি আমাকে ভয় পাও? সত্যি বলছ?

—এ অন্যরকমের ভয়। ভয় হয় তুমি কথা বলবে না, তুমি আদর করবে না। রাতের বেলায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকবে। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে না।

—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। চল।

—কোথায়?

—তোমার মাথার চুলগুলো উস্‌কো খুসকো দেখাচ্ছে। চলতো?

তুতন্‌খ-এর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে অনখেসেন তার নিজের রূপচর্চার ঘরে। সেখানে সুন্দর আসনে তাকে বসায়। তারপর নানান রকমের সুগন্ধি বের করে স্বামীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে দু'হাত দিয়ে তার মাথার রেশমীর মত কেশদামের প্রসাধনে ব্যস্ত হয়। নানান সুগন্ধি মাখিয়ে দেয়। তুতন খ-এর চোখ বন্ধ হয়ে আসে আরামে। তাই দেখে অনখেসেন তার মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেয়।

—কি হল?

—ঘুমোচ্ছো নাকি? তা হবে না। আমি খেটে মরব, আর তুমি ঘুমোবে?

—না তো? আমি ঘুমোই নি। কিন্তু তুমি এসব কর কেন? আমার কেমন লাগে। মনে হয় তোমার খুব কষ্ট হয়।

—মানা করনা কেন?

—তুমি যে রেগে যাবে।

—বুঝেছি। চুপ করে বসে থাক।

এক সময়ে অনখেসেনের কাজ শেষ হয়। সে ঘুরে ফিরে নানান দিক থেকে

তুতনখকে দেখতে থাকে।

—কি দেখছ?

—দেখছি, কেমন লাগছে ফ্যারওকে।

—তাই আবার কেউ দেখে নাকি? আমি তো ছেলে।

—কি বললে? ছেলেদের কেউ দেখে না?

—দেখবে না কেন? কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—তোমাকে আমার দেখতে কত ভাল লাগে। তুমি কত সুন্দর। আমাকে দেখলে কি ভাল লাগে?

অনখেসেন হেসে ফেলে। তুতনখ-এর, মাথা বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে—ভীষণ ভাল লাগে।

হোরেমহেব সেদিন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্ত্রী মুতনেজেমেতকে বলে—তোমাদের রকম-সকম বোঝা দায়।

মুতনেজেমেত একটু অবাক হয়ে বলে—কেন, আমি কি করলাম।

—তুমি না। তোমাদের জাতের কথা বলছি।

—আমাদের জাত?

—হ্যাঁ, মেয়ে জাত।

মুতনেজেমেত হেসে বলে—তাই বল। কিন্তু কি করেছি আমরা?

—তোমরা কী যে কর, আর কেন যে কর, সেকথা কি বুঝে-সুঝে কর? হয়ত তোমরাও জাননা, কেন কর।

মুতনেজেমেত একটু চিন্তিত হবার অভিনয় করে। তারপর বলে—আমি অন্তত জেনে শুনে করি।

—কেউই কর না। তোমাদের সম্রাজ্ঞীর কথাই ধর।

সঙ্গে সঙ্গে মুতনেজেমেতের সমস্ত উৎসাহ নির্বাপিত হয়। অনখেসেনের চেয়ে বড় শত্রু তার আর কেউ নেই। সম্রাজ্ঞী তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কন্যা হলেও, ওই অসামান্য রূপবতী নারী তার স্বামীর মনকে এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হ্যাঁ, একথা সে আজও মর্মে মর্মে অনুভব করে।

হোরেমহেবকে তুষ্ট রাখার জন্য সে প্রশ্রয়ের স্বরে বলে—কেন, সম্রাজ্ঞীর কি দোষ ?

— দোষের কথা বলছি না, বুদ্ধির কথা বলছি।

মুতনেজেমেত এতক্ষণে স্বামীর কথা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলে—তুমি ভুল করছ। অনখেসেন পৃথিবীতে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী রমণী।

—তোমার চেয়েও ?

মুতনেজেমেতের খট্‌কা লাগে। হঠাৎ স্বামী তাঁকে এতটা প্রাধান্য দিচ্ছে কেন ? তবু তার মুখে নিজের এতবড় প্রশংসা শুনে মনে দোলা লাগে।

সে বলে—আমার তো তাই মনে হয়! নইলে সে সম্রাজ্ঞী হল কি করে ? আমি তো হলাম না ?

—ভুল করছ। সে তার বুদ্ধিবলে সম্রাজ্ঞী হয় নি। ফ্যারওর কন্যা সে। সম্রাজ্ঞী হবার পথ তার চিরকাল পরিষ্কার ছিল। সে যদি তোমার পর্যায়ের কোন নারী হত আজ তাহলে তাকে অতিক্রম করে তুমি সম্রাজ্ঞী হতে।

—কি যে বল। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। তাছাড়া তার রূপ ? ওই রূপ কার আছে ?

হোরেমহেব সহসা এগিয়ে আসে। স্ত্রীকে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করে কানের কাছে ফিসফিস করে বলে—কেন ? তোমার ?

কথা কয়টি মধু বর্ষণ করে যেন। এই একই ধরণের কথায় ভুলে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিয়েছিল হোরেমহেবকে। আজও তার গাঢ় স্বরের এই কথাগুলির সম্মোহনী শক্তি অসীম। আজও একইভাবে সে তার দেহ-মন উন্মোচিত করে দিতে পারে। অন্য কোন পথ নেই। এ যেন অটেন দেবতার ইচ্ছা।

তবু আগে যেমন হোরেমহেবের সব কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করত, সব কথা সোনার অক্ষরে মনের মধ্যে গেঁথে যেত, এখন অতটা যায় না। একটা দ্বিধা থাকে। সেই দ্বিধা তাকে বড় পীড়া দেয়। অথচ এখন সে হোরেমহেবের স্ত্রী।

তার সেই সুখ-সাগরে ভেসে চলার দিনগুলো বড় ভাল ছিল। তখন তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল হোরেমহেব আর কারও নয়—শুধু তার একার। কিন্তু কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর একদিন প্রথম সেই আঘাত এল। আঘাত এল হারেমের এক পরিচারিকার মাধ্যমে।

সেই পরিচারিকা এসে বলেছিল—কেমন বুঝছ, আমাদের সেনাধ্যক্ষকে ?

আনন্দে গলে গিয়ে সে বলেছিল—উঃ, বলে বোঝাতে পারব না। তোমাকে

বলতে তো বাধা নেই। হারেমে আমি যখন সবার অবহেলার পাত্রী, এমনকি আমার দিদিও যখন আমাকে পাত্তা দিত না, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে। তোমাকে আমি চিরকাল মনে রাখব।

—জানি। তাই তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে এলাম।

শুষ্ক মুখে মুতনেজেমেত প্রশ্ন করে—দুঃসংবাদ!

—হ্যাঁ। কি করে যে বলি।

—বল, আমি সহ্য করব।

—তোমার উনি তো নতজানু হয়ে অনখেসেনের কাছে প্রেমভিক্ষা করছেন।

—কি বললে?

—অনেকেই দেখেছে।

চোখে সেদিন অন্ধকার দেখেছিল সে। তারপর রূঢ় সত্যকে মেনে নিয়েছিল। নারীকে কত কিছুই সয়ে নিতে হয়। নইলে যে উপায় নেই। পুরুষেরা অনেক কিছু দূরে নিক্ষেপ করে। নারীরা তা পারে না। হয়ত তাদের সেইভাবে গড়া হয়নি।

সেদিন মুতনেজেমেত অটেন দেবতার কাছে এইটুকুই প্রার্থনা করেছিল, হোরেমহেবের যেন মোহমুক্তি ঘটে। সে যেন আবার তাকে একান্তভাবে ভালবাসতে পারে।

তারপরে একটা কাণাঘুষো কিছুদিন চলতে থাকলেও, কেউ নিশ্চিতভাবে তাকে এসে বলতে পারেনি যে অনখেসেনের কাছে হোরেমহেব আবার গিয়েছিল। তবু সে যেন অনুভব করত সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তেও হোরেমহেবের হৃদয়ের একটি বিশেষ তন্ত্রী যেন ঠিকমত বাজছে না। ফলে ছন্দোবদ্ধ একটা সুরেলা-ভাবের অভাব থেকে যাচ্ছে—তাল কেটে যাচ্ছে। তারপর সেটাই অভ্যাসে পরিণত হয়। এখন আর কিছু মনে হয় না। তাছাড়া একথাও সত্য যে অনখেসেন এখন আর স্বামীর হৃদয়-জুড়ে বসে নেই। অত্যন্ত বাস্তববাদী তার স্বামী। অবাস্তবকে সযত্নে পরিহার করে।

কিন্তু আজ আবার সম্রাজ্ঞীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় তার বুক দুরু দুরু করে। স্বামীর কথার প্রত্যুত্তরে সে দুঃখের হাসি হেসে বলে—তার রূপ আর আমার রূপ? সে যদি হয় জ্যোৎস্নাবিধৌত রাতের একমাত্র রাণী চাঁদ, আমি তাহলে কৃষ্ণপক্ষের কোটি কোটি তারার যে কোন একটি—যার নিজস্ব কোন বিশেষত্ব নেই, নেই কোন গরিমা। সে সঙ্কোচে দ্বিধাগ্রস্থভাবে মিট্‌মিট্ করে জ্বলে।

হোরেমহেব সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে তার স্ত্রীকে দু'হাতে শূন্যে তুলে নিয়ে শয্যার দিকে যেতে যেতে বলে —না না না। ভুল নয়। তুমি জান না তুমি কতটা সুন্দরী।

মুতনেজেমেতকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে মুখ এনে সে বলে – ওরা তোমার রূপের প্রশংসাও করতে দেয় নি কাউকে, পাছে ফ্যারওর কন্যারা রেগে যায়। ফ্যারও-এর প্রাসাদে তাঁর কন্যাদের চেয়ে বেশী রূপবতী কারও অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

মুতনেজেমেত স্বামীর বাঁধভাঙা সোহাগ-আদরে বিগলিত হলেও তার সচেতনতা লুপ্ত হয় না। সে কোনরকমে তাঁর ওষ্ঠাধরকে একটু মুক্ত করে নিয়ে বলে—কিন্তু এতদিন পরে আজ একথা কেন?

—কেন জান? নানান কাজের মধ্যে থেকে কত সময় তোমাকে অবহেলা করি, কত সময় মেজাজ হারিয়ে রূঢ় হই। এক একদিন গভীর রাতে সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়। তুমি তখন ঘুমে অচেতন থাক। তুমি জান না তখন তোমাকে কিভাবে পাগলের মত আদর করি।

—সত্যি? আমার ঘুম তো ভাঙেনি কখনো।

—ভেবে দেখো তো?

—কি জানি। হয়ত ভেঙে থাকবে দু' একদিন।

—আমি যখন ছোট, তখন সম্রাজ্ঞী নেফেরতিতির আগুনের মত রূপ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তখন নারীর রূপকে স্বভাবতই দেখতাম অন্য দৃষ্টিতে। তবু ওই রূপ আমার মনকে রূপ-সচেতন করে তোলে। নেফেরতিতির বয়স বেড়েছে। শেষ যে দিন তিনি থীবস্-এ রওনা হলেন সেদিনও তিনি রূপবতী ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু রূপের সেই ছটা ছিল না। হারেমে তোমাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। এ যে নেফেরতিতি! একই রূপ, একই হাসি। তোমার দিদি অবশ্য তখন হারেমেই ছিলেন। তুমি তো জান কত কষ্ট করে, কত ঝুঁকি নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতাম।

—বড় সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। আমাকে যখন দিদির সঙ্গে তুলনা করতে তখন আমার মনের যে কী অবস্থা হত—

—আজও সেই তুলনাই করছি।

—আজ আমি একটু পরিণত। আজ জানি, দিদির রূপ দুর্লভ। শুধু অনখেসেন। হ্যাঁ, সে বোধহয় দিদিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

—আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম সেরকম। তাই আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল।

ভুল ভেঙেছে। অনখেসেনের মুখটুকু খুবই সুন্দর! কিন্তু তোমার মুখ দেহ বাহুদ্বয়—সর্বাঙ্গ দিয়ে তার চেয়ে অনেক সুন্দরী।

—তাই বুঝি?

—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

—বিশ্বাস করতে খুবই ইচ্ছা হয়।

—শোন, আমার সাধ, আমার স্বপ্ন তোমাকে সম্রাজ্ঞী করা।

—তার চেয়ে বল তোমার স্বপ্ন ফ্যারও হওয়া।

—একটার সঙ্গে আর একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তোমার কি সাধ হয় না অনখেসেনকে সরিয়ে সম্রাজ্ঞী হতে?

মুতনেজেমেতের চক্ষুদ্বয় জ্বলে ওঠে। সে বলে—হ্যাঁ হয়। আমি ওদের ঘৃণ্য ছিলাম। অনখেসেনকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে হয়।

তখন হোরেমহেব তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফিস্‌-ফিস্ করে কথা বলে যেন কক্ষের দেয়াল শুনে ফেলবে।

শেষে হোরেমহেব বলে—রাজি?

—হুঁ।

হোরেমহেবের পত্নী মুতনেজেমেতকে সহসা প্রাসাদে আসতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না অনখেসেন। কারণ সে সম্রাজ্ঞী হবার পরে হোরেমহেব নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছে। অন্তত বাইরে থেকে সেইরকমই মনে হয়। কারণ তুতন্‌খকে তো বটেই, অনখেসেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে কথা বলে। আর তারই নির্দেশে বোধহয় মুতনেজেমেতও প্রাসাদে আসা ছেড়ে দিয়েছে। নইলে প্রাসাদ তার অপরিচিত স্থান নয়। এখানে ফ্যারও বা তাঁর স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশের কিংবা তার ত্রিসীমানায় আসার অধিকার কারও না থাকলেও মুতনেজেমেত অনুমতি নিয়ে সেই সব অঞ্চলেও আসতে পারে। নেফেরতিতির ভগিনী হিসাবে তার খাতির আছে। হোরেমহেবের পত্নীরূপে সেই খাতির বৃদ্ধি না পেলেও মর্যাদা কিছুটা বেড়েছে বৈকি।

অনখেসেনকে সামনে দেখে মুতনেজেমেতের মধ্যে একটা অস্পষ্ট চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়।

সে বলে—আপনাকে হারেমের বাইরে দেখব ভাবিনি।

—আমি সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ এখানে আজ? বহুদিন তো দেখিনি।

—না আসি নি। কদিন থেকেই আসব ভাবছিলাম। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। দিদির কাছেই তো মানুষ হয়েছি। তবে দিদি একটা কথা বলত। বলত—ভুলে যাস না, তুই একজন সাধারণ মেয়ে। ফ্যারওর কন্যাদের সমকক্ষ ভাবিস না নিজেকে কখনো। আমার মেয়েদের সঙ্গে বেশী যোগাযোগ করিস না।

অনখেসেন একদৃষ্টে মুতনেজেমেতের দিকে চেয়ে থাকে। মুতনেজেমেতের চোখের পাতা ওঠানামা করে কয়েক বার। সে বলে—আমি দিদির কথা মেনে চলেছি বরাবর। আপনিই বলুন, কখনো বেশী ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছি?

—অতটা ভেবে দেখিনি। তবে কমই মেলামেশা করতাম আপনার সঙ্গে।

—আজ মনে হলো, মাঝে মাঝে এখানে আসলে ক্ষতি কি? আমার জানা অনেকেই আছে আজও। বাইরে কোথায় ঘুরব? বড় একঘেঁয়ে লাগে।

অনখেসেন বুঝতে পারে তার কাছ থেকে একটা অলিখিত ছাড়পত্র চাইছে এই রমণী। কিন্তু কেন? বোধহয়, হোরেমহেব দেখাতে চায় তার পত্নীর সঙ্গে ফ্যারও-পত্নীর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। সে মুতনেজেমেতের কথার কোন জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যায়। মুতনেজেমেত চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাসাদের নারীরক্ষী বাহিনীর প্রধানাকে নির্দেশ দেয় সেনাধ্যক্ষের পত্নীর প্রতি তীক্ষ্ন নজর রাখতে। তিনি প্রাসাদে এলে তাঁর অজ্ঞাতে যেন ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করা হয়।

মাস খানেকের মধ্যে কয়েকটি খবর শুনে অনখেসেন তাজ্জব বনে যায়। সে শোনে, ফ্যারওর কক্ষের একজন পরিচারিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখা গিয়েছে মুতনেজেমেতকে। অস্থির হয়ে ওঠে সে। পরিচারিকাকে এখনি সরিয়ে দিলে মুতনেজেমেত সাবধান হয়ে যাবে। আবার তাকে না সরালে যদি কোন সর্বনাশ হয়ে যায়? সে একবার ভাবে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অয় এর সঙ্গে কথা বলা উচিত। পরক্ষণেই স্থির করে, কাউকে একথা জানাবে না। রক্ষী-বাহিনীর প্রধানা তার মায়েরও অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিল। তার ওপরই সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দেওয়া ভাল। তাকে বলে, পরিচারিকার প্রতিটি গতিবিধির ওপর যেন নজর রাখা হয়। তার কোন কার্যকলাপ যেন দৃষ্টি না এড়ায়।

কয়েক সপ্তাহ পরে, একদিন সেই পরিচারিকাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে রক্ষী প্রধানা। অনখেসেন দেখে পরিচারিকা কাঁপছে। তার মুখ রক্তশূন্য।

অনখেসেন রক্ষী-প্রধানার হাতে ফ্যারও-এর নিজস্ব সুরাপাত্র দেখে স্তম্ভিত হয়।

—কি ব্যাপার! এই পাত্র তোমার হাতে কেন?

পরিচারিকাকে দেখিয়ে সে বলে—ফ্যারও-এর এই সুরাপাত্রে সাদা গুঁড়ো মেশাতে দেখা গিয়েছে একে।

—সাদা গুঁড়ো? কোথায়?

—এই পাত্রের মধ্যে।

—পরিচারিকাকে অনখেসেন জিজ্ঞাসা করে—কি মিশিয়েছ?

—কিছু না।

অনখেসেন বলে—ঠিক আছে, একে বন্দী রাখ। আর প্রতিদিন এই সুরাপাত্র থেকে সুরা পান করতে দাও। এর চেয়ে ভাল সুরা মিশরে নেই।

পরিচারিকা চিৎকার করে ওঠে—না, না।

—কেন?

—ও খেলে আমি মরে যাব।

অনখেসেনের বুক কেঁপে ওঠে। রক্ষী-প্রধানার চোখের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল।

—কি মিশিয়েছ?

—বিষ।

—কে দিয়েছে?

—বলব না।

—বলতে হবে না। আমি জানি। কত অর্থ দিয়েছে?

সে নীরব থাকে।

কেউ জানল না, কেউ বুঝল না অথচ সেই বিশেষ পরিচারিকা সেদিন থেকে উধাও হয়ে গেল। তার হদিশ কখনো আর মিলবে না পৃথিবীতে। অনখেসেনের মনে পড়ে গেল অয়-এর ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা। দুটোই হত্যা, কিন্তু দুই রকমের। একটাতে পাপ আছে, আর একটায় নেই। একটা বিবেককে পীড়িত করে, আর একটি বিবেকের ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করে না। তুতনখ-এর যে শত্রু তাঁকে ক্ষমা করবে না সে।

তবু বিবেক ততটা স্বস্তি পায় না যতটা পাবে ভেবেছিল অনখেসেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পরিচারিকা জঘন্য অপরাধ করেছিল। কিন্তু সেই অপরাধ করেছিল সামান্য অর্থের লোভে। অথচ ফ্যারও আর সম্রাজ্ঞী হবার লালসায় যারা তাকে নিয়োগ করেছিল সেই মূল অপরাধী দু'জন ধরা-ছোঁয়ার

বাইরেই থেকে গেল। তাদের স্পর্শ করতে পারল না।

এই ঘটনার পরে দু-একদিন মুতনেজেমেতকে ব্যস্তভাবে প্রাসাদে আসতে এবং ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। একে ওকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল। তারপর একদিন সরে গেল। সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে সাক্ষাতের সাহস আর সঞ্চয় করতে পারল না।

ভোর হয়েছে সবে। অনখেসেনের নিদ্রা ভঙ্গ হলেও শুয়ে রয়েছে। পাশে তুতনখ নিদ্রামগ্ন। অনখেসেন স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে এক দৃষ্টিতে। সহসা সে লক্ষ্য করে স্বামীর কানের পাশ দিয়ে একটা হালকা শ্মশ্রুর রেখা গালের দিকে নেমে এসেছে। সে পুলকিত হয়। উপুড় হয়ে তুতনখ এর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখে ওপরের ওষ্ঠের ওপরও গুম্ফ-রেখা। সে সেই-ভাবেই ঝুঁকে থাকে তুতনখ-এর মুখের দিকে।

এক সময় তুতনখ-এর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সে চোখ মেলতেই অনখেসেনের আগ্রহ ভরা মুখ দেখতে পায়। খুব আনন্দ হয় তার। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে স্ত্রীর গ্রীবাদেশ। অনখেসেন স্বামীর বুকের ওপর পড়ে যায়।

অনখেসেন তুতনখ-এর কেশের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে বলে—তুমি নাকি দিগ্বিজয়ী বীর হবে?

—হব। নিশ্চয় হব।

—তুমি নাকি আমার জন্যে নীলকান্ত মণি এনে দেবে?

—দেব। তোমার জন্যে না আনলে কার জন্যে আনব? আমি ওসব নিয়ে কি করব? তোমার জন্যে আনলে কত আনন্দ হবে তোমার।

—আমার আনন্দে তোমার কি?

—বা রে, তোমার আনন্দেই তো আমার আনন্দ। তুমি একটা কথা জান না।

—কোন্ কথা।

—তোমার যখন আনন্দ হয়, তখন তা দেখে তোমার চেয়েও আমার বেশী আনন্দ হয়।

—তাই নাকি। জানতাম না তো? এতক্ষণে বুঝলাম কেন আমাকে আনন্দ দিতে চাও। তুমি ভীষণ দুষ্টু।

তুতনখ হাসতে থাকে। যেন খুব জব্দ করে দিয়েছে অনখেসেনকে।

তুতনখ সব রকমের অস্ত্রবিদ্যায় একটু একটু করে পারদর্শী হয়ে উঠছে। যদিও হোরেমহেব দেশের সেনাধ্যক্ষ, তবু তুতনখ-এর প্রশিক্ষণের দেখাশোনার ভার অয়-এর ওপর। অনখেসেন এ ব্যবস্থা করেছে। সে জানে, অয় হোরেমহেবের চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বস্ত। তাছাড়া তুতনখ-এর প্রতি তার স্নেহ রয়েছে। নইলে তুতনখকে ফ্যারাও করার জন্য অত আয়োজন সে করত না। অবশ্য এর মূল কারণ হোরেমহেবের উচ্চাশায় বাধা দেওয়া। তবু অয় অনেক ভাল। সিংহাসনের লোভে সে অন্তত তুতনখকে হত্যা করতে চাইবে না। বরং চাইবে তুতনখ বহুদিন ফ্যারাও হয়ে থাকুক। আরও চাইবে তুতনখ-এর যেন পুত্র সন্তান হয়।

স্বামীর দেহের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সে বলে—তোমার পরীক্ষা নেব কাল।

—কি পরীক্ষা ?

—তোমার হাতের লক্ষ্য কেমন হয়েছে দেখতে হবে।

—বেশ তো।

—কাল আমরা নীল নদ ধরে দক্ষিণ দিকে অনেকটা দূরে চলে যাব। সেখানে অনেক পাখি। তোমার পক্ষী শিকারের পরীক্ষা হবে।

—পাখি আবার শিকার নাকি ? ও তো সবাই পারে। নিরীহ জীব।

—আস্তে আস্তে হবে। তারপর হবে হিংস্র জন্তু শিকার।

—তখন তোমাকে কিছুতেই নিয়ে যাব না।

— আমি যাবই। আমিই তো পরীক্ষা নেব।

—না। যদি কিছু হয়ে যায়।

—কিছু হবে না। তুমি তো সঙ্গে থাকবে। তুমি তোমার রাণীকেও রক্ষা করতে পারবে না ফ্যারাও হয়ে ?

তুতনখ মুশকিলে পড়ে। সে ঢোক গিলে বলে—নিশ্চয় পারব।

সেইদিনই সবাই জেনে গেল যে ফ্যারাও পরদিন রাণীকে সঙ্গে নিয়ে পক্ষী শিকারে যাবেন। এটা একটা নতুন সংবাদ। কারণ অখেন-অটেন কবে শিকারে গিয়েছিলেন প্রবীণরাও মনে করতে পারে না। আর স্মেনখকরের ওসব বিষয়ে কোন উৎসাহই ছিল না। যৌবনের প্রথম শুরুতে তার মধ্যে যে চনমনে জীবনী-শক্তি দেখা দিয়েছিল কয়েক বৎসরের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। সে হয়ে পড়ে নির্জীব। তাই তুতনখ রাণীকে নিয়ে শিকারে যাবেন শুনে সবাই

উৎসাহিত বোধ করে।

ফ্যারও শিকারে গেলে সাধারণ মানুষের মত একা একা যেতে পারেন না। পক্ষী শিকার হলেও তাঁর নিরাপত্তার জন্য লোক-লস্কর, রক্ষীরা যাবেই। হোরেমহেব প্রস্তাব দিয়েছিল, সেও যাবে শিকারে। অনখেসেনের পরামর্শে তুতেনখ তাকে মিষ্টি কথায় ফিরিয়ে দেয়। বলে, সাধারণ এই শিকারে তার সঙ্গে থাকার প্রয়োজন নেই।

নগরীর রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছিল, শিকার-যাত্রা দেখতে। আসলে তারা অল্পবয়সী ফ্যারওর দৃষ্টিনন্দন চেহারা দেখতে ভালবাসে। তার ওপর শুনেছে রাণীও সঙ্গে যাবেন। সুতরাং কৌতূহল অনেক বেড়ে গিয়েছে।

প্রাসাদ থেকে ফ্যারওর শকট নির্গত হয় এক সময়। সবাই ভেবেছিল ফ্যারওর পাশে তাঁর পত্নী উপবিষ্ট থাকবেন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেল অন্যরকম। সবাই দেখল ফ্যারও বসে রয়েছেন একটি উচ্চ আসনে, আর তাঁরই পদতলে বসে সম্রাজ্ঞী একটি একটি করে শর পরীক্ষা করে সযত্নে তূণে রাখছেন। ফ্যারও সহাস্যে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি একটি শর ফ্যারওর হাতে দিয়ে কি যেন বলেন। ফ্যারও মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে শরটি রাণীর হাতে তুলে দেন।

এই দৃশ্যে সবাই মুগ্ধ হয়। তারা বুঝতে পারে, ফ্যারওর বয়স অত কম হলেও রাণী তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন—যথোচিত সম্মান দেন। প্রজাবৃন্দের সামনেও এই সম্মান প্রদর্শনে সম্রাজ্ঞী কুণ্ঠিত নন। সবাই অনুমান করে নেয় ফ্যারওর বয়স যতই কম হোক, তিনি বুদ্ধিমান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। নইলে রাজ্ঞী সবার চোখের সামনে ফ্যারওকে অমন অকুণ্ঠিত চিত্তে মান্য করতেন না। রাণীর এই একটি কার্যে ফ্যারওর আসন সাধারণের মনের অনেক উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত হল।

নগর থেকে অনেক দূরে নীলনদের পার্শ্ববর্তী এক হরিৎ ক্ষেত্রে অনেক রকমের পাখির ঝাঁক। তারা বছরের এই সময় নাম-না-জানা অনেক দেশ থেকেও উড়ে আসে।

ফ্যারওর শকট সেখানে গিয়ে থামল। ফ্যারও মুগ্ধ দৃষ্টিতে পাখিদের দিকে চেয়ে থাকেন। তাদের কূজনে চারদিক মাতোয়ারা। যেন কোন এক বিরাট উৎসবে মেতে রয়েছে তারা। সেখানে ছোট বড় ভেদাভেদ নেই। কত বিভিন্ন ধরণের পাখি পাশাপাশি বসে রয়েছে। দল বেঁধে খাবার খাচ্ছে। কেউ কেউ জলের মধ্যে গা-ডুবিয়ে আরাম উপভোগ করছে।

অনখেসেনে স্বামীকে ওইভাবে তন্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে তার বাহুতে হাত রাখে। তুতনখ সম্বিত ফিরে পায়। তার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল দেখায়।

অনখেসেন তার মুখের দিকে চেয়ে তার হাতে তীর তুলে দিতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়। কিন্তু তা হলে তো চলবে না। তুতনখ-এর বয়স কম। একেতেই সে কোমল স্বভাবের। তার ওপর কম বয়সের জন্য একটু বেশী মাত্রায় অনুভূতি-প্রবণ। নিজেকে শক্ত করে নিয়ে প্রশ্ন করে কি দেখছ।

—পাখি। কী সুন্দর।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি ফ্যারও একথা ভুললে তো চলবে না।

—সেকথা ভুলব কেন ?

—ফ্যারওকে অনেক সময় অতিমাত্রায় কঠোর হতে হয়। নিষ্ঠুর হতে হয়। নইলে রাজ্যশাসন চলে না।

—সে কথা জানি।

—তাহলে দ্বিধা কেন। এই নাও তীর। ওই যে লম্বা গলা নিয়ে রাজকীয় চালে চলাফেরা করছে পাখিটা ওটাকে বিদ্ধ কর।

তুতনখ-এর চোখে কাতর দৃষ্টি ফুটে ওঠে। অনখেসেন সেই দৃষ্টি এড়াবার জন্য অন্য দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—নাও। পরীক্ষা দাও।

তুতনখ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চেয়ে থকে।

—কী হল ?

—ওই যে দূরে গাছে একটা সাদা ফুল ফুটে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ ?

—হ্যাঁ। তাতে কি হল ?

—ওটা এই লম্বা গলার বড় পাখির চেয়ে অনেক ছোট আর অনেক দূরে। এই দেখ।

তুতনখ অনখেসেনের হাত থেকে শরটি নিয়ে বাঁ পা সামনে এগিয়ে দিয়ে জ্যা টানে। পরমুহূর্তেই সেই ফুল কয়েকটি পাতা সমেত মাটিতে ঝরে পড়ে। অনখেসেন বিস্মিত হয়। এই পারদর্শিতা অভাবনীয়। তখুনি তুতনখকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেটা শোভনীয় নয়।

তুতনখ পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে তার লক্ষ্যভেদের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনখেসেন কোন কথা না বলায় সে ভগ্ন কণ্ঠে বলে—সন্তুষ্ট হলে না ?

—না।

—কেন ?

—ওতে তোমার নিশানার পরীক্ষা হল শুধু। বাকী থাকল অনেক কিছু।

—কি বাকী থাকল ?

—তুমি কতটা শক্ত তার প্রমাণ হয়নি। তুমি কতখানি সহ্য করতে পার জানা যায় নি। রক্ত দেখলে তুমি বিচলিত হও কিনা তাও বোঝা যায় নি।

—ও, কি করতে হবে আমাকে।

—লম্বা গলা পাখিটা উড়ে গিয়েছে। ঐ যে দূরে মাঝারি ধরণের মেটে রঙের দুটি পাখি পাশাপাশি বসে একজন আর একজনের গা পরিষ্কার করে দিচ্ছে, ঠোটে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে। ওটির মধ্যে বাঁদিকের পাখিটাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ কর।

—তুমি বলছ কি! ওরা যে তুমি আর আমি।

অনখেসেন হেসে ফেলে। বলে—নাঃ, তুমি ফ্যারও হবার যোগ্য নও। কিন্তু আমি ছাড়ব না। বেশ ওই যে দূরে একটা সাদা রঙের পাখি একা একা বসে ঝিমোচ্ছে, ওটিকে শেষ করে দাও। ও বেঁচে যাবে।

—কেন!

—ওর জোড়া মারা গিয়েছে। নাও, তাড়াতাড়ি কর। দেরি করো না।

তুতেনখ কয়েক মুহূর্ত সময় নিল মাত্র। পাখিটা ওখানেই কাত হয়ে পড়ল। পা দুটো সামান্য কেঁপে উঠল।

—হলো তো ? ওর জোড়া মরে গিয়েছে জানলে কি করে।

—একথা জানতে সময় লাগে নাকি। যাও, ওটাকে নিয়ে এসো। একটু রক্ত দেখ। বন্য পশু শিকার করবে কি করে ?

তুতেনখ জলাভূমিতে নেমে অনেকটা দূরে গিয়ে পাখিকে নিয়ে আসে। তার সঙ্গের লোকেরা ব্যস্ত হয়ে উঠে। অনখেসেন হাত তুলে তাদের নিষেধ করে। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

তুতেনখ বিকৃত মুখে পাখিটা অনখেসেনের পায়ের কাছে রেখে বলে—খুশি ?

—হ্যাঁ। তোমার প্রথম শিকার। আমার কাছে এর মূল্য অনেক।

—হিংস্রপ্রাণী বধ করলে, আর রক্ত দেখলে এতটা বিচলিত হব না।

—হিংস্র প্রাণীদেরও স্নেহ ভালাবাসা সবই আছে। তারা মাংস খায় বলে আর আত্মরক্ষা করার জন্য পালিয়ে না গিয়ে আক্রমণ করে বলে তারা খারাপ নয়। তুমি অবিচার করছ।

—ঠিকই বলছ। তবে তাদের শিকার করার সময়, তারা যখন আক্রমণ করবে, তখন এই নিরীহ প্রাণীটাকে মারার মত মন টলবে না। কারণ জানব আমি না মারলে সে আমাকে মারবে।

অনখেসেন আবার অবাক হয়। বলে—তুমি এত গভীর ভাবে ভাব? আশ্চর্য।

তুখনুখ সঙ্কুচিত হয়।

অনখেসেন বুঝতে পারে তুতনখ-এর শ্মশ্রুগুম্ফ আগের চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে লক্ষ্য করে তুতনখ মাঝে মাঝে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তখন তাকে বড় বেশী বিষণ্ণ মনে হয়। সে নানান ভাবে প্রশ্ন করেও সদুত্তর পায় না। ফলে তার দুশ্চিন্তা বাড়ে। রাগ করে, অভিমান করে, আদর করে কিছুতেই তুতনখ-এর মনোভাব বুঝতে পারে না।

শেষে এক রাত্রে ঠিক করল ওর পাশে শোবে না। অন্য কক্ষে থাকবে। তার মায়ের সময়ের এক পরিচারিকাকে কথাটা বলল। পরিচারিকা শুধু বলে—চেষ্টা করে দেখুন। আমি বাইরে থাকব।

রাত্রে তুতনখ শয্যায় শুয়ে পড়লে, অনখেসেন তার গা চাদর দিয়ে ঢেকে বাইরের দিকে যায়।

—কোথায় যাচ্ছ?

—ঘুমোও। আসছি।

তুতনখ শুয়ে অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ হয়ে যায় তবু অনখেসেনের দেখা নেই। সে পাশে না থাকলে নিশ্চিন্ত হতে পারে না তুতনখ। ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ভাবে কোন কাজ আছে হয়ত অনখেসেনের। তার মুখে শুনেছে, দিদি মার্তে পড়াশোনা করত। সম্রাজ্ঞী হলে ওসব করা ভাল। তাই তারও প্রবল ইচ্ছা ছিল। তারপর তুতনখ এখানে আসার পর সম্রাজ্ঞী হয়েই সে শুরু করে দিয়েছিল। এখন ভালই লিখতে পারে। সব বোঝে। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে লেখে। কখনো পড়ে। এত রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে কি পড়াশোনা করছে?

ছটফট করতে শুরু করে তুতনখ। বুঝতে পারে অনেক রাত হয়েছে।

একেতেই মন খারাপ হয়ে থাকে। কিছু ভাল লাগে না। নেফেরতিতির সঙ্গে থেকে থেকে সে অমেন দেবতার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। একমাত্র তাঁকেই শ্রদ্ধা করে। থীবস্-এ অমেন দেবতার পুজা-মন্দির এখনো দু-একটি টিকে আছে। কিন্তু এখানে একটিও নেই। এখানে অটেন দেবতার প্রতিপত্তি ছিল এতদিন। স্মেনখকরের মৃত্যুর পরে সেই প্রতিপত্তি কিছুটা ঝিমিয়ে পড়লেও এখনো তাঁরই পুজা হয়। একটা অভ্যাস, কৃত্রিম হলেও ছাড়তে সময় লাগে। তাই তুতন্খ-এর মন খারাপ হয়ে থাকে। সে জানে নেফেরতিতিকে কেন নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। নেফেরতিতি নিজেই একটু একটু করে সব কথা তাকে বলেছেন। তিনি তুতন্খকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—কখনো যদি ফ্যারও হতে পারিস, অমেনকে আবার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিস। এইটুকু তোর কাছে প্রার্থনা।

—তুমি এ কি বলছ মা? এ তোমার আদেশ। ফ্যারও যদি কখনো হই, অমেন দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।

—প্রজাদের সমর্থন পাবি। আমি তাদের মনোভাব জানি।

ফ্যারও হয়ে কয়েক বছর কেটে গেল, এখনো মুখ ফুটে একথা উচ্চারণ করতে পারেনি সে। সে লক্ষ্য করেছে, অয় কিংবা হোরেমহেবের কোন দেবতা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। তবে দোহাই দেবার সময় অটেন দেবতার নাম উচ্চারণ করে। কিন্তু অনখেসেনের মনোভাব বুঝতে পারে না। তার মনোভাব না বুঝলে কিছুতেই কোন পদক্ষেপ নিতে পারে না সে। একটা কথা ভেবে মনের ভেতরটা অহরহ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে তার। সে নেফেরতিতিকে কথা দিয়েছে অমেনের পূর্ব গরিমা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু অনখেসেন যদি অটেনে বিশ্বাসী হয় তাহলে সে কি করবে? নেফেরতিতির কাছে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে? নাকি অনখেসেনের মন রাখবে? মৃত ব্যক্তির মর্যাদা রাখবে? নাকি তার সর্বক্ষণের সঙ্গিণীকে তুষ্ট করবে? মৃত ব্যক্তি বড়? না জীবিত ব্যক্তি বড়? এর ওপর আর এক সমস্যা, সে নিজে অমেনের ভক্ত। নিজের বিশ্বাসকেও কি জলাঞ্জলি দিতে হবে শেষ পর্যন্ত?

রাত বেশ শীতল। তবু তুতন্খ-এর সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে। অনখেসেন গেল কোথায়? গায়ের ওপর থেকে চাদর পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে সে শয্যা থেকে নামে। কক্ষের বাইরে এসে দেখে একজন নারী প্রহরীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনখেসেনের প্রাচীন পরিচারিকা।

—রাণী কোথায়?

যথাযথ সম্মান জানিয়ে সে বলে—ঘুমোচ্ছেন।

—ঘুমোচ্ছেন ? কোথায় ?

পার্শ্ববর্তী কক্ষের দিকে আঙুলি নির্দেশ করে পরিচারিকা।

—ওখানে কেন ?

—উনি বললেন, আপনার মন খারাপ। আপনার ওখানে থাকলে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে।

—তাই বলেছেন ?

—হ্যাঁ ফ্যারও।

—ওঁকে গিয়ে বল, আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না। এখুনি যেন আসেন।

—যে আজ্ঞে।

তুতনখ শয্যায় এসে বসার একটু পরেই হাই তুলতে তুলতে নিদ্রাকাতর চোখে অনখেসেন আসে।

তুতনখ তাকে দেখে অবাক হয়ে বলে—তুমি ঘুমোচ্ছিলে ?

মিথ্যা বলতে বাধো বাধো ঠেকলেও অনখেসেন বলে—হ্যাঁ। কি করব। তোমার মন খারাপ। ভাবলাম, একা থাকলে ভাল ঘুম হবে তোমার।

—তুমি কাছে না থাকলে আমার ঘুম হয় ?

না।

—তবে ?

কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্কই নেই। মুখ গম্ভীর করে থাকো। কি হয়েছে কিছুতেই বলতে চাও না।

তুতনখ বলে—বলতে পারলে আমার দুঃখ ঘুচে যেত। কিছুতেই বলতে পারছি না।

—আমি তোমার পর ?

—না। সব চেয়ে আপন। সেই জন্যেই মুশকিল হয়েছে। একদিকে তোমার মা, অন্যদিকে তুমি। একদিকে প্রতিজ্ঞারক্ষা অন্যদিকে তোমাকে সব সময় আনন্দে রাখা। কোনটা বড়। আমি জানি তুমিই আমার সব। কিন্তু মৃতের কাছে শেষ প্রতিজ্ঞা—তার মূল্য ?

অনখেসেন তুতনখ-এর পাশে বসে তার গায়ের ওপর একটা হাত রেখে বলে—তোমাকে জীবিত কিংবা মৃত কারও কথা ভাবতে হবে না। তুমি শুধু বল তোমার সমস্যা কি ? আমি সমাধান করে দেব এক মুহূর্তেই।

—আমি জানি তুমি কি সমাধান করবে।

—কি ?

–তুমি আমার মন দেখবে। তুমি দেখবে আমি কিসে সুখী হই। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে তাই করবে।

—তুমি বড় বেশী আমার কথা ভাব। অত ভাবলে পুরুষেরা এগিয়ে যেতে পারে না। একই জায়গায় আবদ্ধ থাকে।

—তাই বলে তোমাকে দুঃখ দেব ?

নিশ্চয় দেবে। তবে আমি দুঃখ পাব না। কারণ তোমার সুখই আমার সুখ। কেউ আমাকে দুঃখী করতে পারবে না। তুমিও না। কারণ জানি, তুমি আমায় ভালবাস।

তুতনখ-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে—আমি তোমার মায়ের কাছে মানুষ হয়েছি। তিনি আমারও মা বলতে গেলে। তাই তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ও পেয়েছি তাঁরই কাছ থেকে। জানি, এখানে কেউ সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। তুমিও নও।

–কোন্ বিশ্বাসের কথা বলছ ?

–তোমার মা কেন নির্বাসিত হয়েছিলেন তুমি জান ?

—জানব না কেন ? তিনি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন ধর্মবিশ্বাসে। তিনি অমেন দেবতার প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

–তিনি মৃত্যুর দু-এক মাস আগে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, ফ্যারও হলে আমি যেন অমেন দেবতার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনি।

অনখেসেন হাসে। বেশ পরিতৃপ্তির হাসি। এই হাসি তুতনখকে শুধু আশ্বস্ত এবং তৃপ্তই করে না, এই হাসির মধ্যে সে দেখে এক নতুন সৌন্দর্য্য, যা তাকে জীবনে এই প্রথম তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। অনখেসেনকে সে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পায়। এতক্ষণ অনখেসেন তার গায়ে হাত রেখেছিল, এখন সে সেই হাত ছাড়িয়ে দিয়ে তাকে টেনে নেয় নিজের কোলের ওপর। বিস্মিত অনখেসেন কোলের ওপর শুয়ে তুতনখ-এর মুখের দিকে চায়। সে দেখতে পায় সেই ঝড়ের সঙ্কেত যার জন্য এতদিন সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। আত্মসমর্পণের দিন এতদিনে এল।

তুতনখ কথা বলতে পারছিল না। কি করবে ভেবে পায় না। অনখেসেনকে সম্পূর্ণরূপে পেতে চায়, কিন্তু কিভাবে পেতে হয়, জানে না সে। সে ছটফট করে। অনখেসেনকে দলিত-মথিত করে।

অবশেষে অনখেসেনকেই মুখ্য ভূমিকা নিতে হয়। মনে মনে সে ভাবে, এই প্রথম আর এই শেষ। এর পরে আর তুতনখকে পরিচালিত করতে হবে না। এরপর থেকে সে হবে নায়ক। সব কিছু পরিচালনার ভার তার। অনখেসেন হয়ে থাকবে নিষ্ক্রিয়—ওর হাতের পুতুল।

সুখের ঘোর যেন কাটতে চায় না অনখেসেনের। তার আরও ভাল লাগে তুতন খ-এর প্রভুত্বব্যঞ্জক মুখভাব দেখে। সে এখন অনখেসেনের দেহ-মন সব-কিছুর ওপর প্রভুত্ব করছে।

তুতনখ-এর অপার কৌতূহলের যেন শেষ নেই। অবাক চোখে বার বার সে অনখেসেনের দিকে চায়।

—আর কত দেখবে বল তো ? দেখার কি শেষ হবে না ?

তুতনখ শুধু হাসে।

—তোমার সমস্যার কথাই তো শেষ হয়নি।

—আজ কিছু বলব না। কালও না, পরশুও না।

—তবে কবে ?

—কি জানি ?

—আমি তোমাকে একটা কথা বলব ?

—কি কথা ?

—শুনে তোমার খুব আনন্দ হবে। তখন আমাকে আরও ভালো লাগবে।

—এর চেয়ে ভাল লাগে নাকি ?

—হ্যাঁ লাগে। মনের মিল হলে আরও ভাল লাগে। কোন বাধাই থাকে না দু'জনার মধ্যে। এখন তুমি বুঝতে পারছ না। ক'দিন পরেই পারতে, যদি মিল না হতো।

—তুমি কোন্ কথা বলছ ?

অনখেসেন তুতনখ-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে আমিও অমেনকে শ্রদ্ধা করি। অটেনকে নয়।

তুতনখ প্রায় লাফিয়ে ওঠে। তারপর আনন্দোচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ খুঁজতে থাকে।

অনখেসেন আনন্দাতিরিক্ত হতাশা প্রকাশ করে বলে—আমি জানতাম।

পরদিন সকালে প্রবীণা পরিচারিকা অনখেসেনের মুখ দেখে বুঝতে পারে সম্রাজ্ঞীর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। নেফেরতিতির কথা মনে পড়ে যায় তার। এভাবে মাত্রাতিরিক্ত সুখের ঘোর নিয়ে সবাই তো জীবন শুরু

করে। শেষ পর্যন্ত কয়জনের দীর্ঘস্থায়ী হয় এই সুখ। অমেন দেবতা কি এই মেয়েটির দিকে চাইবেন? জানে না সে।

অনখেসেন পরিচারিকাকে প্রশ্ন করে—কি দেখছিস?

—ঠিকই দেখছি।

—বাজে কথা বলিস না।

—মনের চোখ দিয়ে না হয় আমি দেখতাম শুধু। কিন্তু চর্মচক্ষু দিয়েও দেখতে পাবে অন্য সবাই।

—কি? কোথায়?

অনখেসেন মুখে মাথায় হাত বোলায়।

—উঠবে না। ওই মোমের মত মুখে এঁকে দেওয়া হয়েছে যে।

—তুতেন খটা যেন কি—

—ওঁর কি দোষ? উনি তো ফ্যারও। সব দোষের উর্ধ্বে।

অনখেসেন একটা কটাক্ষ হেসে চলে যায়।

কয়েকদিনের মধ্যে দু'জনা মিলে সিদ্ধান্তে আসে রাজধানী আর এখানে নয়, থীবস্-এ স্থানান্তরিত করতে হবে। সেখানে অমেনের মন্দিরগুলো সংস্কার করতে হবে। সেখানকার সবাই অমেনের ভক্ত। নিশ্চিন্তে তাঁর আরাধনা করবে সবাই।

অনখেসেন বলে—আমাদের দু'জনার নামও পরিবর্তন করতে হবে।

—হ্যাঁ, এখন তুমি অনখেসেন অটেন—অটেনের মধ্যে বসবাসকারী। তখন হবে অনখেসেন অমেন—অমেনের মধ্যে বাস।

অনখেসেন তুষ্ট হয়ে বলে—আর তুমি?

—এখন আমি তুতেন্খটেন - অটেনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তখন হব তুতেন্খামেন—অমেনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

—বাঃ, খুব ভাল হবে। কবে যাব আমরা?

—অয়কে জিজ্ঞাসা করব। সময় লাগবে কিছুটা।

তুতেন্খ যেন হঠাৎ সাবালক হয়ে উঠেছে। সে এখন সব বিষয়ে বেশী সক্রিয়। এতদিন সে অনখেসেনের মুখের দিকে চাইত। এখন অনখেসেন তার মুখের দিকে চায়। প্রতিটি ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা তার। তাকে সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে অনখেসেন নিশ্চিন্ত। ভাবে, এবারে একটু ভালভাবে রূপচর্চা করতে হবে। এক এক রাতে এক এক ভাবে তুতেন্খকে চমকে দিতে হবে। তুতেন্খ তার মধ্যে অপার রহস্যের সন্ধান পাবে। পড়া পুঁথির মত একঘেঁয়ে লাগবে

না তাকে। রূপচর্চার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সে আনার ব্যবস্থা করে নানা দেশ থেকে।

রাজধানী স্থানান্তরের কথা শুনে অয় বলে—সে যে বৃহৎ ব্যাপার।

—একটু বৃহৎ বৈকি। আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি তিন মাস শেষ হবার আগেই চলে যেতে চাই। ওখানে আমি ছিলাম। সব জানি। কোন অসুবিধা হবে না।

অয় ভাবে, তুতনখ-এর আর কতটুকু বয়স। তার পক্ষে এই পরিশ্রমসাধ্য কাজটা কিছু নয়। কিন্তু এই প্রবীণ বয়সে অত ঝঞ্ঝাট সামলাতে তার প্রাণান্ত হবে। তবু যেতে হবে। ফ্যারও নাবালক হলেও তিনি ফ্যারও। তাঁর আদেশ শিরোধার্য। তাছাড়া তুতনখ তাঁর স্নেহভাজনও বটে।

হোরেমহেব কথাটা শুনে প্রথমেই বলে ওঠে—অসম্ভব।

তুতনখ প্রশ্ন করে—কেন?

—সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

—স্থায়ী সৈন্যদল আর কতটুকু? কয়েক হাজার। তাদের নিয়ে কি অসুবিধা হবে।

—হবে বৈকি। তারা সবাই এখানকার মানুষ। যেতে চাইবে না।

—সেটা কোন যুক্তি নয়। আমি ফ্যারও আমি চাই রাজধানী স্থানান্তরিত হোক। সৈন্যরা কি চাইছে, সেটা দেখা আমার কাজ নয়। সেটা আপনি দেখুন। ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কাজ আপনার। আপনি দেখুন কিভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করানো যায়। তেমন হলে কিছু সৈন্যকে ছাঁটাই করে দেবেন।

হোরেমহেব ফ্যারওর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ছেলেটা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সহসা খুব পরিণত হয়ে উঠেছে। কথার মধ্যে ব্যক্তিত্ব আর আদেশের দৃঢ় স্বর।

সে বলে—ঠিক আছে। ব্যবস্থা একটা হবে।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে হোরেমহেব স্ত্রীকে বলে—কী ব্যাপার বলতো?

মুতনেজেমেত জিজ্ঞাসা করে—কিসের ব্যাপার?

—তোমরা যাদু জান নাকি?

—আমরা ? আমরা কারা ?

—তোমরা মেয়েরা।

মুতনেজেমেত একটু থাতস্থ হয়ে মুচকি হেসে বলে—তা একটু জানতে হয় বৈকি ?

—কি রকম ?

—তুমি কি রকমের যাদুর কথা জানতে চাও আগে বল।

—ধর, কোন অসহায় অবোধ শিশুকে মেয়েরা হঠাৎ বড় করে দিতে পারে ? তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটাতে পারে ?

একটু ভেবে নিয়ে মুতনেজেমেত বলে—পারে বৈকি ? কিন্তু তুমি কার কথা বলছ ?

আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

—পারে। নিশ্চয় পারে।

তার আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বরে হোরেমহেব একটু অবাকই হয়।

সে বলে—তুমি পার ?

—হ্যাঁ।

আমার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পার ?

—নিশ্চয় পারতাম।

—আনো দেখি।

—বললাম তো আগে পারতাম। এখন পারব না। অন্তত তোমার বেলায়।

-কেন ?

–এর জন্যে চাই পরস্পরের প্রতি গভীর অকুণ্ঠ ভালবাসা। সেই ভালবাসা দিয়ে ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ – সব রকমের পিরামিড গড়ে তোলা যায়। তোমার মধ্যে যে সেই জিনিষ নেই।

–তোমার মধ্যে বুঝি আছে ?

—নিশ্চয় ছিল। এখনো খুঁজলে কিছু কিছু ভালবাসার অবহেলিত টুকরো লুটিয়ে থাকতে দেখা যাবে।

—যত সব মন গড়া প্রলাপ।

—প্রলাপ নয়। এর চেয়ে সত্যি কিছু নেই। তুমি আমার সেই স্বর্গীয় ভালবাসার সুযোগ নিয়ে আমাকে দিয়ে ফ্যারওকে বিষপানে হত্যার চক্রান্ত করেছিলে পর্যন্ত। সেদিন থেকেই ভালবাসার তন্ত্রী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

—সফল হলে এতদিনে সম্রাজ্ঞী হতে পারতে।

—এখন ভাবি, ওভাবে সম্রাজ্ঞী হয়ে হয়ত শান্তি পেতাম না।

থীবস্-এ এসে তুতনখ-এর খুব আনন্দ। পরিচিত স্থান। নেফেরতিতির স্মৃতি বিজড়িত স্থান। তাঁর হাত ধরে অমেনের মন্দিরগুলোতে সে যেত, প্রার্থনা করত। এখন সে যায় নেফেরতিতির কন্যাকে নিয়ে। সে মনে মনে ঠিক করে অনখেসেনের আনন্দের জন্য বাসভবনের সামনেই একটা মন্দির নির্মাণ করবে।

অয় মনে মনে ভাবে, এ ভালই হল। হোরেমহেবকে এখানে গুছিয়ে বসে ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি গড়ে তুলতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে ভাগ্য যদি তার ভাল হয় তাহলে অন্য কথা। সে লক্ষ্য করেছে হোরেমহেবের স্ত্রী মুতনেজেমেতের কাছে কয়েকজন অচেনা স্ত্রীলোক যাতায়াত করে। নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে সে। সুরাপাত্রে বিষ মেশানো হয়ত সম্ভব হবে না, কিন্তু উপায়ের তো শেষ নেই। এ সব বিষয়ে দুরাত্মার বুদ্ধিও খেলে খুব বেশী। তুতনখ যেভাবে দ্রুত একজন যোগ্য প্রশাসক রূপে গড়ে উঠেছে তাতে হোরেমহেবের উতলা হবার কারণ যথেষ্ট। তাকে বিতাড়িত করা একেবারে অসম্ভব। কারণ সে সেনা পরিবারের সন্তান। সেনাদের ওপর তার স্বাভাবিক একটা আধিপত্য রয়েছে। সে যেমনই হোক সেনারা তাকে পছন্দ করবে। ফ্যারওর বিরুদ্ধে তারা যাবে না বটে, কিন্তু হোরেমহেবের অপসারণও শান্তভাবে মেনে নেবে না। সুতরাং লোকটা যতই অনভিপ্রেত হোক, সে থেকে যাবে। তাকে নিয়েই চলতে হবে তুতনখামেনকে।

মুতনেজেমেত প্রায়ই অমেনের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করে। থীবস্-এর সবাই জেনে গিয়েছে সেকথা। সবাই তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়, যখন সে মন্দির থেকে প্রত্যাবর্তন করে। অনখেসেনের কানেও কথাটা যায়। অয়কে প্রশ্ন করতে অয় বলে —কি করে বলব কেন এত যায়।

—নিজের মর্যাদা বাড়াতে নয় তো?

—হতে পারে। সম্রাজ্ঞীর পরেই যাতে সাধারণের মনে স্থান করে নিতে পারে। সবই সম্ভব। তবে আসল খবরটাও এনে দিতে পারি একটু চেষ্টা করলে।

—দেখুন না চেষ্টা করে।

দুদিন পরে অয় হাসতে হাসতে বলে—আসল খবরটা জেনে এলাম।

কৌতূহলান্বিত অনখেসেন বলে—কি ?

—মুতনেজেমেত এমনিতে যেমনই হোক, সে মন্দিরে যায় সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। এর মধ্যে কোন রকমের বদ মতলব নেই।

—কিরকম ?

—সে সন্তানবতী হতে চায়। খুব অশান্তি চলছে দু'জনার মধ্যে।

—স্বাভাবিক। অমেন যেন ওর প্রার্থনা শোনেন।

মনে মনে ভাবে অনখেসেন, সন্তান না হলে নারী হয়ে জন্মে লাভ কি ? তারও নিশ্চয় হবে। সে বুঝতে পারে সে এখন না হোক, কোনদিন সন্তানবতী হবেই। তুতনখামেন এখন বলতে গেলে পরিপূর্ণ পুরুষ। সে বেশ বলিষ্ঠও। আর বছর চারেকের মধ্যে তাদের একটি সন্তান হবে হয়ত। অবশ্য সেই সন্তান পুত্রও হতে পারে, আবার কন্যাওশ। প্রথমটা যাই হোক অমেনের আশীর্বাদ রূপে মেনে নেবে তাকে।

সেদিন দ্বিপ্রহরের কিছু পরে ফ্যারও তুতনখামেন অনখেসেনের কক্ষে আসে।

—তুমি !

—হ্যাঁ।

—এখন !

- তুমি এভাবে কথা বলছ কেন অনখেসেন !

—কিভাবে বলছি ?

—আমার মনে হচ্ছে অন্যায় করে ফেলেছি। আমি তো তোমার কাছে এসেছি।

--সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

তুতনখ-এর উৎসাহ একেবারে উধাও হয়। সে চুপ করে থাকে। কথা হারিয়ে যায়।

—কথা বলছে না কেন ?

তুতনখ অপ্রস্তুতের মত বলে—না। আমি চলে যাচ্ছি।

—কেন ?

—তুমি আমাকে চাও না বলে। তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি অনেক বড়। আমি চলি।

—দাঁড়াও।

তুতনখ দাঁড়ায়। অনখেসেন তার কাছে আসে। তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের

দিকে চায়।

ফ্যারওকে সে প্রশ্ন করে—আমার কথার উত্তর দিলে না তো? এখন এলে কেন?

—বললাম তো ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি চলে যাচ্ছি।

তুতনখ এগিয়ে যেতে চায়। অনখেসেন তার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—সরে যাও অনখেসেন।

—কোথায় যাচ্ছ?

—আমি আমার কক্ষে যাচ্ছি।

—তোমার সভার কাজ শেষ হয়ে গেল, এত তাড়াতাড়ি? অয় হোরেমহেব, অন্য সবাই চলে গিয়েছেন?

—হ্যাঁ, আমার ভাল লাগছিল না। তাই চলে যেতে বলেছি।

—তোমার শরীর খারাপ?

—না।

—তবে?

—এমনিতে।

—এমনিতে খারাপ লাগে কখনো? তুমি একটা কিছু লুকোচ্ছ।

অনখেসেন লক্ষ্য করে তুতনখামেনের মুখ রক্ত বর্ণ হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে শুধু শুধু এতক্ষণ একে কষ্ট দিচ্ছে। তবু বড় ভাল লাগছিল ওকে দুঃখ দিতে।

তুতনখ তার রাণীকে ধাক্কা দিতে গিয়েও থেমে যায়। বুঝতে পারে ভুল করে ফেলছিল। অনখেসেনের ব্যথা লাগতে পারে। সে তাকে একটু ঠেলে চলে যাবার চেষ্টা করতেই অনখেসেন তার হাঁটুর কাছে বসে পড়ে দু'হাটু জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

তুতনখ ব্যস্ত হয়ে ওঠে—কি হ'ল? লেগেছে, আমি তো কিছু করিনি।

—তুমি আমাকে আর ভালবাস না।

—কে বলল? তোমাকে ভাল না বাসলে বাঁচব কি করে। তুমি কি সব বলছ? ঘরে ঢুকতেই রেগে উঠলে। এতক্ষণে বুঝেছি নিশ্চয় তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। ওঠো!

—না।

—ওঠো লক্ষ্মীটি।

অনখেসেন তবু তার হাঁটু জড়িয়ে বসে থাকে। তুতনখ তখন তাকে দু'হাতে

অতি সহজেই তুলে নেয়।

—কি করছ ?

—তোমাকে শুইয়ে দেব। তোমার শরীর নিশ্চয় খারাপ।

—আমার শরীর খুব ভাল আছে।

—তাহলে ?

—তুমি ঘরে ঢুকে আমার কথার উত্তর দিলে না কেন ?

—কোন কথা ?

—অসময়ে চলে এলে কেন ? সে কথা বললে না আমাকে।

—বারে, তোমার কথা বারবার মনে হচ্ছিল। দেখলাম কোন কাজ নেই। তাই ছুটে এসেছিলাম।

এবারে অনখেসেন তুতেনখ-এর গ্রীবা বেষ্টন করে বলে—এই সত্যি কথাটা এতক্ষণ বলা হয় নি কেন ?

— ঘরে ঢুকতেই তো তুমি ধমকাচ্ছিলে।

অনখেসেন খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে বলে—আমার খুব ভাল লাগছিল।

—কি ভাল লাগছিল ?

—তোমার মুখ কেমন হয়ে যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, যে ফ্যারওকে সবাই কত সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, তাকে আমি কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছি। তার মানে হ'ল আমি ফ্যারওর চেয়েও উঁচুতে।

তুতেনখ গম্ভীর হয়ে যায়। সে কোন কথা বলে না।

—কি হ'ল আবার, উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

—তুমি এই সামান্য কারণে আমাকে এত কষ্ট দিলে ? কত আশা নিয়ে ছুটে এসেছিলাম।

অনখেসেন তাকে আরও ঘনিষ্টভাবে টেনে নিয়ে বলে—খুব হয়েছে। এবারে এসো, সুদে আসলে তোমাকে আমি পুষিয়ে দিচ্ছি।

ওরা শয্যায় শুয়ে শুয়ে ঠিক করে অপরাহ্নে বাইরে বের হবে। অনেক দিন দু'জনা মিলে বাইরে যাওয়া হয় নি।

সেদিন তারা শকটে করে চলে গেল নগরের বাইরে বহু দূরে। সঙ্গে রক্ষী বাহিনী। ফ্যারওর শত্রুর অভাব তো নেই। তুতেনখ-এর এই বাধ্যবাধকতা ভাল লাগে না।

সে অনখেসেনকে বলে—একদিন পালাতে হবে।

—সেকি ?

—ঠিক পালাব, তুমি দেখে নিও।

—কেন ?

— চারদিকে এত লোকজন নিয়ে বের হতে আমার ভাল লাগে না।

—তাই বলে পালাবে ?

—হ্যাঁ।

—একা ?

—তা কেন ? একা পালিয়ে মজা কোথায় ? তুমিও তো সঙ্গে থাকবে। দু'জনা মিলে আরও দূরে চলে যাব। একটা পাহাড় থাকবে নীলনদের কাছে। লোকজন কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি। ভাল হয় না খুব ?

—খুব ভাল হয়। কিন্তু ওখানে কি খাওয়া হবে ?

—কেন, বনের পশু ?

—আর পাখি।

—ঠিক আছে পাখিও না হয় মারব। তুমি যখন বলছ।

—তা পাখির পালক ছাড়াতে পারবে ? কাটতে পারবে ?

—শিখে নেব। দু'দিনেই শিখে নেব। তুমি ভেবোনা।

—আর রান্না ?

—তুমি পারবে না ?

—আমিও তাহলে শিখে নেব।

—বেশ রাজি।

—কিন্তু মশলা, লবণ—এসব ?

তুতেনখ বলে ওঠে—অত সব ভাবার দরকার কি আগে ভাগে ? সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে। কিন্তু অনেক দূর তো চলে এলাম। আজকে এখানেই নেমে একটু ঘুরে বেড়াই। ওই তো বেশ একটা তৃণভূমি রয়েছে—কিছু কিছু গাছ-পালাও আছে। চল, ওদিকে চলে যাই।

—চল।

ওরা শকট থেকে নেমে হাত ধরাধরি করে ছুটতে থাকে। ভুলে যায় ওরা একটি সুন্দর দেশের সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী। মনে হয় দুই অল্পবয়সী ক্রীড়া সঙ্গী প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। রাজরক্ষীরা ওই দৃশ্যের যেমন সাক্ষী, তেমনি সাক্ষী আশে-পাশের প্রতিটি বৃক্ষ এবং বৃক্ষশাখার বিহঙ্গ কুল।

কিন্তু ওদের ছোটাছুটি খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ওরা লক্ষ্য করে আকাশ

জুড়ে সহসা মেঘের সঞ্চার হয়েছে। বৃষ্টি হবেই—দুর্লভ বৃষ্টি।

তুতনখ বলে—আমি ভিজব।

অনখেসেনের মনে শঙ্কা। সে বলে —চল আগে গাড়ির কাছে যাই।

—কেন ?

—বৃষ্টি তো বেশীও হতে পারে।

—বেশী আবার হয় নাকি ?

—আজ খুব ঘন মেঘ। কেমন ডাকছে, আমার ভয় করছে তোমার জন্যে।

তুতনখ-এর মন খারাপ হয়ে যায়। সে বলে—তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। দেখো একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই সময়টুকু একটু আনন্দ করে নিই। কত বছর পরে আবার এমন দিন আসবে কে জানে।

—আমার মনে হচ্ছে বেশী বৃষ্টি হবে।

—কখনো বেশী হতে দেখিনি।

—তুমি দেখোনি, কিন্তু বহু বছর আগে নাকি অনেক বৃষ্টি হয়েছিল, দিনের পর দিন ধরে।

তুতনখ হেসে বলে—ওসব কল্পনা।

—হতে পারে।

—জান অনখেসেন, ওই যে বৃষ্টি আসছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা পরিচিত সুঘ্রান পাছি।

—তোমার কথা বুঝলাম না।

—বৃষ্টি যেদিন আসে বছরের সেই দিন সেই সময় আমি একটা গন্ধ পাই।

—কিসের গন্ধ ?

—একটা মিষ্টি গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ দিনের কথা মনে পড়ে যায়।

—কোন দিন ?

—তুমি হয়ত ভুলে গিয়েছ। একদিন আমরা দু'জনা শকটে করে নীলনদের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফেরার পথে বৃষ্টি এলো। আমরা শকট থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। তখন অখেন-অটেন ছিলেন ফ্যারও। আমি কত ছোট। তোমার মা একটা বিশেষ সুগন্ধি তেল দিয়ে তোমার কেশচর্চা করে দিতেন। শকটে তুমি আমায় জড়িয়ে ধরেছিলে। সেই তেল আর তোমার গায়ের গন্ধ মিলিয়ে সুন্দর সুঘ্রান পাচ্ছিলাম তোমার বুকে মাথা রেখে। এখনো বৃষ্টি এলেই সেই সুঘ্রান পাই। আজও পাচ্ছি। অথচ সেই তেল এখন আর তুমি ব্যবহার কর না।

—তবে চল শকটে গিয়ে বসি, সেদিনের মত। দেখি পাও কিনা সেই একই গন্ধ একই ভাবে বসে। পেতেও তো পারো। এটাও কল্পনা হতে পারে।

—বৃষ্টিতে ভিজব যে।

—পরে ভিজতে পারবে।

—বেশ চল।

ওরা ছুটতে থাকে শকটের দিকে। আকাশের মেঘও ওদের তাড়া করে। একটু পরেই নামে মিশরের অতি আকাঙ্খিত বৃষ্টি।

তুতনখ নানান ধাতুর বিভিন্ন ধরণের দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়ে আমেনের মন্দির গুলোর ভেতরে আর বাইরে প্রতিষ্ঠিত করে। দেখতে অসাধারণ সুন্দর দেখায়। সে ইতিমধ্যে হোরেমহেবকে নির্দেশ দিয়েছিল বিরাট যুদ্ধাভিযান আপাতত যখন সম্ভব নয় তখন দক্ষিণের দিকে ছোট খাটো অভিযান চালাতে। হোরেমহেব অমান্য করতে পারেনি ফ্যারওর নির্দেশ। বেশ কিছু যুদ্ধবন্দীকে এনে উপহার দেয় ফ্যারওকে। তুতনখ সেই সব বন্দীদের শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগায়। রাস্তা-ঘাট নির্মান করে।

অয় একদিন ফ্যারওকে বলে—বৃদ্ধ হতে চললাম। একটা সখ আজও পূর্ণ হলো না।

—কোন্ সখ!

—আমার নিজের জন্য একটা সমাধি করার ইচ্ছা।

- আপনি তো শুরু করেছিলেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু অত লোক পাব কোথায়? আপনি যদি কিছু বন্দীদের দেন, তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে পারি।

তুতন খ বলে—বেশ তো নিন। কত চান?

—হাজার খানেক।

—নিন। আমার নিজের জন্যে তো আপাতত দরকার নেই।

অয় সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়।

অয় শ্রমিক পেয়েছে শুনে হোরেমহেবও চেয়ে বসে ফ্যারওর কাছে। ফ্যারওকে বলে—আমারও ইচ্ছা একটা সমাধি সৌধ তৈরী করি নিজের জন্যে।

—নিশ্চয় করবেন। তবে এখন কেন? আপনি তো যুবক বলতে গেলে। অয় এর কথা আলাদা। সত্যিই তো। তিনি যথেষ্ট বয়স্ক।

—জীবন মরণের কথা কেউ কি বলতে পারে?

—তা পারে না বটে। তাই বলে একজন শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তো তার সমাধি তৈরী করায় না। সেকথা চিন্তা করতে চায় না কেউ। ভয়ে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমার কথাই ধরুণ। আমি নিজের জন্যে এখনো কিছু করার কথা'ভাবছি না। এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কথা ভাবব কেন?

—আপনি একেবারে তরুণ। তাছাড়া আমাকে যুদ্ধবিগ্রহে যেতে হয়। যুদ্ধাস্ত্র বয়স মানে না।

-আমাকেও যেতে হতে পারে যুদ্ধে।

—আমি থাকতে? তা হয় না।

—ফ্যারও হয়ে যুদ্ধে যাব না ?

—নিশ্চয় যাবেন। তবে এই সব ছোট খাটো যুদ্ধে নয়। সিরিয়া কিংবা আরও ওদিকে যেতে হলে ভিন্ন কথা।

—আপনি লোক অবশ্যই পাবেন, কিন্তু অয়-এর মনস্কামনা পূর্ণ হোক আগে। আমি শ্রমিকদের যে ভাবে কাজে লাগিয়েছি তাদের আর অন্য কোথাও দেওয়া যায় না। আপনি বরং কিছুদিন পরে আব একবার যুদ্ধে যান। কিছু বন্দী নিয়ে আসুন।

হোরেমহেব আশাহত হয়। বলে—বেশ। তাই হবে।

কিছুদিন থেকে অনখেসেনের মনে শৈশবের সেই ভীতি-বিজড়িত স্মৃতিগুলো ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। ভেবে পায় না, কেন এমন হয়। এই প্রাসাদ তো ছেলেবেলার প্রাসাদ নয়। লোক লস্করও পাল্‌টে গিয়েছে। এখন প্রাসাদের প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষ তার বিশ্বস্ত। মা নেফেরতিতির মত সেও নিজের একটি গোষ্ঠী তৈরী করে নিয়েছে। এদের মধ্যে গুপ্তচরও রয়েছে। এরা প্রয়োজনে বার্তা নিয়ে গিয়ে অন্যত্র পৌঁছে দিতে পারে। রাণীর জীবন বিপন্ন হতে দেখলে এরা যুদ্ধও করতে পারে। তাই এখন অনখেসেনের নিশ্চিন্ত থাকার কথা। তবু ভেতরে ভেতরে অশান্তি। একটা যুক্তিহীন আশঙ্কা তার মনকে সব সময় ভারী করে রাখে।

তুতেনখ-এর সোহাগও তাকে শান্তি দিতে পারে না। তবে সে তার মনের কথা তুতেনখকে জানতে দিতে চায় না। না চাইলে কি হবে, কোনটা অভিনয় আর কোনটা অভিনয় নয়, এটা সহজেই বুঝতে পারে তুতেনখ।

—তোমার কি হয়েছে ?

—কিছু না তো ?

—আমার কাছে কি গোপন করা সম্ভব ? শুধু শুধু নিজে কষ্ট পাচ্ছ।

এবারে অনখেসেন একেবারে ভেঙে পড়ে। তার অশ্রুজলে স্বামীর বুক ভিজে যায়।

সে বলে—আমার সব সময় মনে হয় একটা বিপদ আসছে।

—কিসের বিপদ ?

—জানি না। বুঝতে পারি না। তবু কেমন যেন মনে হয়।

—কেমন করে হবে ? দেশের অরাজকতা এখন একেবারে কমে এসেছে। সবাই নিজের ধর্ম পালন করতে পারছে। সৈন্যদলেরা মাঝে মাঝে আশে-পাশের দেশে গিয়ে যুদ্ধ করে আসছে। তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা খুশী। কৃষকদের এখন আর অত বেশী বেগার খাটতে হচ্ছে না। তাদের স্থান পূর্ণ করেছে বন্দীরা। তবে কেন তোমার মনে অশান্তি ?

—এ অশান্তি সেই অশান্তি নয় তুতেনখ। এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

তুতেনখ একটু হতাশ একটু চিন্তিত হয়। স্ত্রীকে এভাবে ভেঙে পড়তে সে দেখেনি। বরং অনেক সময় অনখেসেন তার মনকে সতেজ করে তুলেছে। তাকে উৎসাহ দিয়েছে।

—তোমার কি মনে হয় কেউ ষড়যন্ত্র করছে ?

—না। আমি মুতনেজেতের ওপর দৃষ্টি রেখেছি। সে এখন নিজের যন্ত্রণাতেই কাতর। এখনো তার সন্তান হয় নি। হোরেমহেব বোধহয় আকারে ইঙ্গিতে তাকে কিছু শোনায়। মাঝে মাঝে তাকে অমেনের বেদীর ওপর অশ্রুপাত করতে দেখা গিয়েছে।

—তবে ?

—আমি জানিনা।

—তোমার মন খারাপ থাকলে আমি যে নিরাশ হয়ে পড়ি। তুমি শুধু বল, কি করলে তুমি শান্তি পাবে, আমি জীবন দিয়ে তাই করব।

দুঃখের হাসি হেসে অনখেসেন বলে—সেকথা কি আজ নতুন করে বলে দিতে হবে তুতেনখ ? আমি যে তোমার কী, সেকথা আমার চেয়ে কেউ বেশী

জানে না।

পরদিন তুতনখ সভায় গেলে, অনখেসেন ঠিক করে সে অমেনের মন্দিরে যাবে। সেখানে গিয়ে আকুল প্রার্থনা জানাবে তার মনের ভীতি দূর করে দিতে, যে কালো ছায়া মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে অপসারিত করে দিতে।

মন্দিরের বিশাল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে সে দেখে দূর প্রান্তের বেদী মূলে মাথা রেখে একাকিনী এক রমণী বসে রয়েছে। নিস্পন্দ তার দেহ। কে এ? কৌতূহলী অনখেসেন একটু একটু করে এগিয়ে যায়।

কাছে গিয়ে দেখে মুতনেজেমেত নিমীলীত চক্ষে অঝোর ঝরে অশ্রু পাত করে চলেছে। বিশীর্ণ হয়েছে তার শরীর। তার রূপের ছটাও যেন মলিন? অনুকম্পা জাগে মনে। নিজের কথা ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হয় অনখেসেন। একবার ভাবে, নিঃশব্দে আবার ফিরে যাবে প্রাসাদে। এই দুঃখিনীকে নিজের উপস্থিতির কথা না জানানোই ভাল। কাঁদুক, মন হালকা করুক। পৃথিবীতে সবাই অল্প বেশী কাঁদতে চায়। পারে না। কারও কাঁদা আসেনা। কেউ অবকাশ পায় না। আবার অনেক নির্বোধ আছে যারা নিজেরাই জানে না তারা কত দুঃখী। তাদের অনুভূতির বৃত্তি অকেজো। আবার অনেকে আছে যারা পরম সুখের দিনেও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কল্পিত দুঃখ তৈরী করে কাঁদে।

কিন্তু কেনই বা ফিরবে প্রাসাদে? সেও তো মুতনেজেমেতের মত আর এক দুঃখিনী। দেবতার কাছে সবাই সমান। সবার সমান অধিকার প্রার্থনা জানাবার।

সেই সময় মুতনেজেমেত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চক্ষু উন্মীলিত করতেই নিকটে দণ্ডায়মান সম্রাজ্ঞীকে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে।

—সম্রাজ্ঞী।

সঙ্কুচিত অনখেসেন বলে—আমি জানতাম না তুমি এখানে আছ। চলে যাচ্ছি।

মুতনেজেমেত উঠে দাঁড়িয়ে বলে—না না, আমার হয়ে গিয়েছে। আমিই যাচ্ছি।

—ও।

—আমি নিজে থেকে জীবনেও আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। আজ দেবতাই আপনাকে পাঠিয়েছেন। তাই কথা বলতে পারলাম। এই কথা বলাটুকু যে কতখানি আমার পক্ষে সে কথা শুধু আমিই জানি।

—কেন?

—আমি অপরাধী। অন্যের প্ররোচনায় আপনার সর্বনাশ করতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার মন সহজেই কলুষিত হতে পেরেছিল। কারণ মন ছিল ঈর্ষা-কাতর।

—আজ ও কথা থাক। এই মন্দিরে দেবতার সামনে ওকথা কেন ?

—নিজেকে ভার মুক্ত করার সুযোগ পেয়েছি আজ। আমার কখনো নিজে থেকে আপনার সামনে দাঁড়াতে সাহস হত না।

—যা অতীত তা অতীতের গর্ভেই থাক।

-না। আমি জানি কেন আজ আমি নিঃসন্তান। সেদিনের সেই পাপের জন্য। কে চায় সম্রাজ্ঞী হতে ? আমি চাই শুধু একটি মাত্র সন্তান। আপনি বিশ্বাস করুন।

—বিশ্বাস করি।

—আজ আমার জীবনে একটুও সুখ নেই। স্বামী কোনদিনই ভালবাসতেন না। আগে তবুও একটু অভিনয় করতেন। এখন আমার প্রতি একেবারে বিরূপ।

—থাক। ওসব বলে লাভ কি ?

—না। লাভ নেই। জানি সে কথা। তবু বলতে পেরে ভাল লাগছে।

—আমি একটু প্রার্থনায় বসব ভাবছি। সেই জন্যেই এসেছিলাম।

—হ্যাঁ। আমার অন্যায় হয়েছে। আমার প্রতি নজর রাখা স্বাভাবিক। তাই বলে সম্রাজ্ঞী নিজে নজর রাখতে এসেছেন একথা আমি না ভাবলেও, এখানে যে সবাই প্রার্থনায় আসেন, পুজোয় আসেন, সেটা বোঝা উচিত ছিল। আমি চলি।

মুতনেজেমেত ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় প্রধান দ্বারের দিকে। যতক্ষণ না সে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় ততক্ষণ অনখেসেন তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর প্রার্থনায় বসে।

অনেকক্ষণ সে চেষ্টা করে মনকে একাগ্র করে তোলার। পারে না কিছুতে। মুতনেজেমেতের অস্তিত্ব তার কথাবার্তা মনকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।

সে প্রাসাদে ফিরে যায়।

রাতে দু'জনা শোবার পরে তুতনখ একবার অনখেসেনের গায়ে হাত দেয়।

সে বলে—না।

—কেন ?

—রাত ভোর হলে নতুন সূর্য উঠবে। তখন হয়ত আমার মনের এই ভীতি কেটে যাবে ? তখন আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করব।

—কিন্তু তিন চার দিন সূর্য তিন চার বার উঠল। তোমার মন ভাল হচ্ছে না।

—কালকে হবে। লক্ষ্মীটি আজ ঘুমোও। আমার মনে হয় মাঝে মাঝে বাবার পাগলামী আমার ওপর ভর করে।

—বাজে কথা।

—তুমি বললে কি হবে, এমন হয়। মার্তও এমন হয়ে গিয়েছিল।

—মার্তের কথা জানি না। তবে তুমি হবে না। এসো।

—না। অমন করো না।

—বেশ। কালকে নতুন সূর্য উঠুক আবার। অমেন কি বলেন দেখি।

—ঠাট্টা করতে নেই।

তুতনখ পাশ ফিরে শোয়। অনখেসেন তার গায়ে একটা হাত রাখে। একসময় দু'জনা ঘুমিয়ে পড়ে।

কয়েকদিন পরে অনখেসেনের মনের সেই কালো ছায়া মনে হল কেটে যাচ্ছে। আরও দু'দিন পরে সে বেশ স্বাভাবিক হয়। এই ক'দিন তুতনখকে বড় কষ্ট দিয়েছে সে স্বার্থপরের মত। কতবার সে কাছে আসতে চেয়েছে তার, অথচ অনখেসেন নির্লিপ্ত থেকেছে। রাতে তুতনখ কাছে গড়িয়ে এলে সে দু'হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। একটু পরেই তুতনখ পাশ ফিরে শুয়েছে। সারা রাত একই ভাবে পড়ে থেকেছে এদিকে আর একবারও ফেরেনি।

আজ রাতে তুতনখ-এর সব কষ্ট ভুলিয়ে দিতে হবে। তাই সন্ধ্যা হতেই সে ছটফট করতে থাকে কখন রাত হবে। তারপর সত্যিই রাত হয়। সে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। রোজই সে সাজে, কিন্তু আজকের রাতের সজ্জা আরও সুন্দর।

কিন্তু তুতনখ তার দিকে ফিরেও চাইল না। সে বুঝতে পারে, রাগ হয়েছে ফ্যারওর। এই রাগ ভাঙাতে হবে। খুব বেশী দেরি হবে না। অন্য কিছুতে না হলে একটু চোখের জল ফেললেই—ব্যস। তার কষ্ট তুতনখ একটুও সহ্য করতে পারে না। অশ্রুজল পড়তে দেখলে মনে হয় তুতনখ-এর হৃদপিণ্ড চুইয়ে রক্ত ঝরছে বুঝি। ঠিক তেমন ছটফট করে।

ঘরের কোন একটি আলো জ্বলছিল। সেটিকে আরও কাছে নিয়ে আসে অনখেসেন। উসকে দেয় আলোটি। তারপর তুতনখ-এর পাশে বসে তার গায়ে হাত রেখে বলে—ফ্যারও।

তুতনখ তার দিকে চেয়ে দেখে।

—আমাকে দেখেত কেমন লাগছে ?

—ভাল।

—ব্যস্ ? আর কিছু বলবে না ?

—কি বলব ?

—আমাকে দেখে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তুতন্‌খ নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে—হ্যাঁ।

—তাহলে কর আদর। চুপ করে শুয়ে আছ কেন ?

তুতন্‌খ বলে - কাল করব।

এই প্রথম অনখেসেন নিজেকে অপমানিত বোধ করে। শেষে তুতন্‌খ তাকে এভাবে প্রত্যাখান করল। তার রূপের তার ভালবাসার কোন মূল্য দিল না। সে তো ইচ্ছে করে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়নি। তার মনটা সত্যিই খুব খারাপ ছিল —মনে শঙ্কা ছিল। তাই বলে তুতন্‌খ এভাবে প্রতিশোধ নেবে ? ঠিক আছে সে তবু কাঁদবে না। দেখা যাক ক'দিন এভাবে থাকতে পারে। একটু কাঁদলেই তো এখনি গলে যাবে। দরকার নেই কাঁদার।

সে শুয়ে পড়ে ওইভাবেই। শুয়ে ছট্‌ফট্ করে। তার প্রত্যাশা ছিল রাত আর একটু গভীর হলে তুতন্‌খ-এর একটা হাত এসে পড়বে তার গায়ের ওপর। এলো না। এইভাবেই ভোর হয়ে গেল।

সকালে উঠে সে প্রথম অনুভব করল তুতন্‌খ তাকে ইচ্ছে করে জব্দ করেনি। তার একটা কিছু হয়েছে। সেই আগের মত কোন কারণে মন খারাপ।

ফ্যারওর পাশে গিয়ে অনখেসেন বলে—অত সুন্দর করে সাজলাম, তুমি মুখ ঘুরিয়ে রাখলে কেন ?

—আমার কিছু ভাল লাগছে না।

—কি হয়েছে ?

—জানি না।

—শরীর খারাপ ?

—তেমন তো কিছু বুঝছি না।

—আজ কি বাইরে যাবে না ?

—যেতে হবে। দরকারী কাজ আছে।

অনখেসেন লক্ষ্য করল গত রাতের মতই নিষ্প্রাণ সে। অথচ সব সময় প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর থাকে সে।

—আজ তুমি ফিরে এলে তোমাকে নিয়ে অমেনের পুজো দিতে যাব। দেখবে

সব ভাল হয়ে যাবে। আমি সেদিন কিছুই করিনি, শুধু কিছুক্ষণ ওখানে গিয়ে বসেছিলাম। তাতেই সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

—বেশ যাব।

তুতনখ-এর এই পরিবর্তনে মনে মনে শঙ্কা জাগে তার। অথচ চিকিৎসক ডাকবে কিনা বুঝতে পারেনা। মন খারাপ হলে অমেন দেবতা নিশ্চয় ভাল করে দেবেন। আজকের দিনটা দেখে নেওয়া ভাল। কালও যদি এমন থাকে তাহলে চিকিৎসককে বললেই চলবে।

সেদিন সন্ধ্যায় তারা গেল অমেনের মন্দিরে। সেখানে তুতনখ-কে পাশে বসিয়ে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করল সে। ঘরের মধ্যে দেবতার সদাহাস্যময় মুখ। অনখেসেনের কেবলই মনে হতে লাগল, সেই মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে সেটি কঠোর হয়ে উঠছে। সেই চোখের স্নিগ্ধ চাহনি নিষ্ঠুরতায় ভরে উঠছে। পাশে তুতনখ যেন অন্য জগতের মানুষ। পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই বলে মনে হচ্ছে। অনখেসেন ডুকরে কেঁদে ওঠে।

—কেঁদোনা। চল ফিরে যাই।

—তুমি এমন করছ কেন? তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

— না। আমি সবই বুঝছি। আমার কিছু ভাল লাগছে না। চল ফিরে যাই।

—চল।

ভোর হতে অনখেসেনের ঘুম ভাঙে। সে তুতনখ-এর গায়ে হাত রাখতেই চমকে ওঠে। গা গরম।

সে তাড়াতাড়ি স্বামীর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে ডাকে। তুতনখ চোখ মেলে একটু হাসে। তার চোখ রক্তবর্ণ।

— তোমার কি হয়েছে তুতনখ।

বিড়বিড় করে সে বলে—কিছু না।

—তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

তুতনখ কিছু উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

—তুতনখ।

—আমি ঘুমোবো।

—তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে?

—না। গায়ে ব্যাথা।

অয়কে সংবাদ পাঠায় অনখেসেন। চিকিৎসকদের ডাকে। চারদিকে রটে যায়

ফ্যারও অসুস্থ।

অয় আসে। তুতেন্‌খ-এর মুখের দিকে চায়। মুখখানা রক্তবর্ণ দেখায়। অস্বাভাবিক লাগে তার কাছে। অসুখ মানুষ মাত্রেরই হয়। কিন্তু মুখের চেহারা এমন হয় না।

চিকিৎসকেরা ফ্যারওকে দেখে গম্ভীর হয়ে যায়। অনখেসেনের প্রশ্নের উত্তরে বলে—খুব গুরুতর অসুখ।

—সারবে তো?

—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

—এই অসুখ ভাল হয়ে যায় তো?

চিকিৎসকরা নীরব থাকে। তাই দেখে অয় তাদের একজনকে একান্তে ডেকে নিয়ে যায়। দু'জনার মধ্যে অল্প একটু কথা হয়। অয় সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে যায়। হোরেমহেব একদল সৈন্য নিয়ে সমুদ্রের দিকে গিয়েছে। আজকালের মধ্যেই ফিরে আসার কথা। অয় সেদিকে লোক পাঠায়। তাকে নির্দেশ দেয় হোরেমহেবকে বলতে যে ফ্যারওর ইচ্ছা আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করে বেশী পরিমাণে রৌপ্য যেন নিয়ে আসে হোরেমহেব।

অয় দিনের শেষে অসংখ্যবার এসে ফ্যারওর খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে। বারবার অনখেসেনের পাশে দাঁড়িয়ে বলে—একটুও চিন্তা করো না। রোগটা একটু কঠিন বটে, তবে ভাল হয়ে যাবে। ফ্যারও বলে কথা।

—কিন্তু ওর মুখ চোখ দেখে আমার ভাল লাগছে না। ও বাঁচবে তো?

—কি যে বল তুমি। এই সব অসুখ তো আগে কখনো দেখোনি, তাই এমন মনে হচ্ছে। আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

—কিন্তু ও যে বড় কষ্ট পাচ্ছে। ওই দেখুন কেমন করছে।

—অসুখ হলে তো সবাই অমন করে। আর এই অসুখ তো সাধারণ অসুখ নয়। ভুলে যেও না এটা ফ্যারওর অসুখ। সাধারণ মানুষের মত নগণ্য কিছু ফ্যারওর হয় না।

—ওই দেখুন কেনন করে উঠল। মনে হচ্ছে খুব কষ্ট পাচ্ছে, অথচ বলতে পারছে না।

—চিকিৎসক তো দেখছে। একটু পরে আবার আসবে। ওকে সর্বক্ষণ এই ঘরে বসিয়ে রেখে তো লাভ নেই। নইলে আমি বসিয়ে রাখতে পারি। ও তাই চায়। আমি তোমার কথা ভেবে মাঝে মাঝে আসতে বলেছি। তোমার অসুবিধা হবে। তুমি ফ্যারওর পাশে বসলে তিনি আনন্দ পাবেন মনে।

—সেই হুঁশ কি আছে ? ডাকলেও যে কথা বলছে না।

—বলবেন বলবেন। আস্তে আস্তে বলবেন।

অনখেসেন অয়-এর হাত জড়িয়ে ধরে বলে—আপনারা ওকে বাঁচিয়ে দিন। ও না বাঁচলে আমিও মরব। ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

— অবুঝ হয়ো না। ওভাবে নিজেকে কষ্ট দিতে নেই। ওই দেখ চিকিৎসক আসছে।

চিকিৎসক ফ্যারওকে দেখল। অয়-এর সঙ্গে কয়েক নিমেষের দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপর বাইরের দিকে পা বাড়াতেই সম্রাজ্ঞী সামনে এসে সজল চোখে বলে —কেমন দেখলেন ?

এবার অয় বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে—আমি তো বললাম ধীরে ধীরে ফ্যারও সুস্থ হবেন। আমার কথা বিশ্বাস করছ না কেন ?

অয়-এর কণ্ঠস্বর একটু অন্যরকমের শোনায়। বোধহয় দুর্ভাবনার তারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। হতে পারে। তুতন্‌খকে কত স্নেহ করে। সেও নিশ্চয় ব্যথা পাচ্ছে।

ঠিক দু'দিন পরে ফ্যারও তুতনখামেনের মৃত্যু হল। অনখেসেন তার দেহের ওপর আছড়ে পড়ে কাদতে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ আর কাঁদবে। ফ্যারও-এর দেহ নিয়ে যাবার জন্য চাপ দিতে থাকে সবাই। দেহটিকে মাসখানেক ধরে সংরক্ষণের উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

কিন্তু অনখেসেন ছাড়তে চায় না। এই দেহের সঙ্গে সঙ্গে তার মর্যাদাও লুপ্ত হয়ে যাবে। মার্তের এমন হয়েছিল। সে স্বচক্ষে দেখেছে সেই দৃশ্য। মার্ত পাগল হয়ে গিয়েছিল।

শেষে অয় এসে একটু কড়া স্বরে অনখেসেনকে বলে—বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ছেড়ে দাও।

চমকে ওঠে অনখেসেন অয়-এর কণ্ঠস্বরে। এতটুকু সমবেদনা নয়, এতটুকু স্নেহ নেই সেই স্বরে। সে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অয়-এর দিকে।

অয়-এর চাহনি তখনো ভ্রূকুটিপূর্ণ। সে বলে—ছেড়ে দাও। অনেক হয়েছে। পৃথিবী থেমে থাকতে পারে না।

অনখেসেনের চোখের জল মুহূর্তে শুকিয়ে যায়। তার উদ্বেলিত বিরহ বেদনা নিমেষে কোথায় মিলিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে অয়-এর উদ্দেশ্য। ভেতরটা পাষাণ হয়ে ওঠে তার। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে সহজে ছাড়বে না এই সিংহাসন।

যতদিন না তুতনখ-এর দেহ সমাধিস্থ হচ্ছে তত দিন নতুন ফ্যারও নির্বাচিত হতে পারে না। ইতিমধ্যে হোরেমহেব ফিরে এসেছে। এই অভাবিত সুযোগ দেখে সে-ও পুলকিত। অয় যাকে তার কাছে প্রেরণ করেছিল সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফ্যারওর মৃত্যু আসন্ন জেনে সে হোরেমহেবকে গুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ সেনাবাহিনী তার অধীনে। তাছাড়া সে অলপবয়সী। অয় আর কতদিনই বা বাঁচবে।

তবু অয়কে অতিক্রম করে হোরেমহেব রাজাশাসনের ভার পেল না। কারণ সে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হলেও, অয় ছিল ফ্যারওদের তিনপুরুষের সহযোগী। তার অভিজ্ঞতা, তার পরিচিতি অনেক বেশী। হোরেমহেবের পক্ষে তাকে ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না।

অনখেসেন অয়কে বলে,— কতদিন আমি প্রাসাদে থাকতে পারব ?

—দুই মাস।

—তারপরে।

—অন্যত্র।

—ফ্যারও কে হবেন ?

—আমি।

—আপনি আর কতদিন ? আপনার পুত্রও নেই। তার চেয়ে আমরা দুজনা থাকতে পারি না ?

—কি করে ? তুমি আমাকে বিয়ে করবে ? কিন্তু এখন তা হয় না।

—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র নেই কোন ?

—না।

—কি করে থাকবে ? খুন করিয়ে বালি চাপা দিয়ে দিলে কি আর থাকে ?

অয়-এর মুখ চোখ কেমন হয়ে যায়। সে বিকৃত কণ্ঠে বলে—কি বললে ?

—পৃথিবীতে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হিসাবে কোন জীবকে সৃষ্টি করেন নি আমেন। সবার বুদ্ধিতেই ফাঁক থেকে যায়।

—তুমি জান ?

—বহুদিন থেকে। কাউকে বলিনি।

—তোমার সঙ্গে মিলিতভাবে শাসন করতে পারি।

অনখেসেন মনে মনে জানে, বাধ্য হয়ে অয় স্বীকার করল। এতদিন তবু প্রাণ সংশয় ছিল না, এখন প্রথম সুযোগেই তাকে ভ্রাতুষ্পুত্রের পথে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইবে অয়।

অনখেসেনের এক একবার তুতনখ-এর মৃতদেহ দেখতে ইচ্ছা হয় খুব। কিন্তু পারেনা। নিয়ম নেই। তাছাড়া তার সেই প্রতিপত্তি তো আর নেই। এখন যেটুকু রয়েছে তা নিয়ম মাফিক। সেই গরিমা, সেই ঔজ্বল্য অন্তর্হিত হয়েছে। সে হিসাব করে দেখে তুতনখামেনকে সমাধিস্থ করতে আর পঞ্চাশ দিন বাকী। এরমধ্যে একটা কিছু চেষ্টা করতে হবে। সে জানে হিতিত্তির রাজা সুপ্পিলুলিমাসের অনেক পুত্র আছে। তার কাছে গোপনে দূত পাঠায় একটি পত্র দিয়ে। পত্রে লিখল—আমার স্বামী মিশরের ফ্যারও মৃত। হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আমি শুনেছি আপনার কয়েকজন সাবালক পুত্র আছে। তাঁদের একজনকে অনুগ্রহ করে আমার কাছে সত্বর পাঠিয়ে দিন। আমি তাঁকে আমার পতি রূপে গ্রহণ করব এবং তিনিই হবেন মিশরের অধীশ্বর।

পত্র প্রেরণ করে অনখেসেন মনে মনে পরিকল্পনা করতে শুরু করে, কিভাবে সবকিছু গুটিয়ে তুলবে। অয় বা হোরেমহেবকে কিছুতেই সে ফ্যারও হতে দেবে না। তুতনখই যখন থাকল না তখন সবই সমান। তাই বলে এই সব বিশ্বাস-ঘাতকদের হাতে কখনই মিশরকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তার চেয়ে বিদেশী ভাল। তাছাড়া হিতিত্তির রাজকুমারকে বিয়ে করলে তার সম্রাজ্ঞীর পদটি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

রাজা সুপ্পিলুলিমাস অনখেসেনের পত্র পেয়ে ভাবলেন যে প্রস্তাবটা আপাত দৃষ্টিতে লোভনীয় হলেও এর মধ্যে বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাঁকে বিপদে ফেলার একটা ফাঁদ ও হতে পারে। তিনি মন্ত্রীদের নিয়ে সলাপরামর্শ করলেন। শেষে রাজকুমারকে না পাঠিয়ে একজন দূতকে পাঠালেন পত্র দিয়ে। তাতে লিখলেন—আপনার পত্র পেলাম। কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে কোন পুত্রকে আপনার ওখানে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে জানান মৃত রাজার পুত্র কোথায়?

পত্রের আদান প্রদান হতে ইতিমধ্যে প্রায় এক মাস কেটে গেল। অনখেসেন এবারে অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে তার উদ্যম বোধহয় সফল হবে না। কারণ বড় বেশী সময় নষ্ট হয়ে গেল। তবু সে লেখে—আপনি আমাকে বিনা কারণে অবিশ্বাস করে অনেক ক্ষতি করে দিলেন। আপনাকে আমি প্রতারণা কেন করব? আমার স্বামী ছিলেন একেবারে তরুণ। তাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই।

সেটাই সবচেয়ে দুঃখের। আজ যদি তাঁর কোন সন্তান আমার গর্ভে থাকত তাহলে হয়ত এমন হত না। অনুগ্রহ করে একজন পুত্রকে পাঠান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখনো চেষ্টা করতে পারি।

পত্রবাহক রাজধানী থেকে যাত্রার দশদিন পরে খবরটা হোরেমহেব জেনে ফেলল। এখানেও সেই বিশ্বাসঘাতকতা। অনখেসেনের অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ভাবল, সম্রাজ্ঞীর দিন শেষ হয়ে এসেছে। এখন তাঁর অনুগত থেকে লাভ নেই। অয় তো এক পা কবরে দিয়ে আছে। হোরেমহেবকে তুষ্ট করা উচিত। সে-ই সম্ভাব্য ফ্যারও।

হোরেমহেব সঙ্গে সঙ্গে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী পাঠায় নির্দেশ দিয়ে। তারপর অয়-এর সামনে এসে বলে—ফ্যারও হবার স্বপ্ন বোধহয় আপনার সফল হবে না। সম্রাজ্ঞী দারুণ চাল চেলেছেন।

—কি রকম?

হোরেমহেব তখন যা শুনেছে অয়কে বলে। সে অবাক হয়ে অয়-এর চোখে ভীতি-মিশ্রিত চাহনি ফুটে উঠতে দেখে।

—আপনি ভয় পেলেন?

—ওকে আপনি চেনেন না হোরেমহেব। ও সাংঘাতিক।

—আপনিই ওকে সাংঘাতিক হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বরাবর।

—যে জন্ম থেকে সাংঘাতিক, তার অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় না। তুতনখ আর ও দু'জনাই প্রখর বুদ্ধির অধিকারী তুতনখকে তো দেখলেন।

—তা দেখলাম বটে।

— অনখেসেনও সেই রকম।

— তাহলে এতদিন ওদের জন্য প্রাণ দিলেন কেন?

— ওদের নিমক খেয়েছি বলে। কিন্তু এখন আর সেই প্রশ্ন ওঠে না।

—কি করবেন? হিতীত্তির রাজকুমার এতক্ষণে থীবস্-এর পথে।

—আপনি গতিরোধ করুন।

—সে তো আর সসৈন্যে আসছে না নিশ্চয়। এলেও মুষ্ঠিমেয় কিছু লোক সঙ্গে আছে হয়ত। তাকে ঠেকাতে অভিযান চালানো যায় না?

—সে যেন না আসে এইটুকু দেখুন। আমি আর কতদিন ফ্যারও থাকব? আমি তো নিঃসন্তান। সুতরাং—

—জানি। লোক পাঠিয়েছি। রাজকুমার এদেশে পৌঁছোতে পারবে না। নিজের দেশেও ফিরে যাবে না। বলে দিয়েছি।

—বেশ করেছেন। এবারে তুতনখকে সমাধিস্থ করে ফেলতে পারলে বাঁচি। একটা নতুন সমাধি মন্দির করতে তো অনেক সময় লাগবে। সবে শুরু হয়েছে।

হোরেমহেব একটু ইতস্তত করে বলে—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আপনার নিজেরটা তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওখানে ব্যবস্থা করুন না। ইতিমধ্যে নিজের সৌধ শুরু করে দিন নতুন করে।

অয় সপ্রশংস দৃষ্টিতে হোরেমহেবের দিকে তাকায়।

--দারুণ পরামর্শ দিয়েছেন তো। হ্যাঁ তাই হবে। পরশু দিনই হোক তাহলে?

—নিশ্চয়। যত দেরি, তত বিপদ।

তখন দ্বিপ্রহর। বাইরে ঝড় উঠেছে। চারদিকে বালুময়। অনখেসেন অস্থির ভাবে পদচারণা করছে ঘরের মধ্যে। হিতিত্তির রাজকুমার কত দূর এলো কিংবা আদৌ আসছে কিনা সে বুঝে উঠতে পারে না। সে শুনেছে অয় স্থির করেছে তার নিজের জন্য নির্মীয়মান অর্ধসমাপ্ত সমাধি সৌধে তুতনখামেনের শবদেহ নিয়ে যাওয়া হবে পরশু। সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হবে। এর মধ্যে হিতিত্তির রাজকুমার যদি পেঁাছে যেতেন, তাকে সবার সামনে স্বামী রূপে বরণ করে নিলে কেউ কিছু করতে পারত না। অয় ও নয় হোরেমহেবও নয়। কিন্তু কিছুতেই খবর পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ তার নিজস্ব অশ্বারোহী দু'দিন আগে জানিয়েছে রাজকুমার রওনা হয়েছেন।

সেই সময় পরিচারিকা এসে বলে, হোরেমহেবের পত্নী মুতনেজেমেত তার দর্শনপ্রার্থিনী।

বিস্মিত হয় অনখেসেন। মুতনেজেমেতকে থীবস্-এ আসার পরে খুব কমই দেখেছে। কথা হয়েছে মাত্র একবার সেই মন্দিরে প্রার্থনার সময়।

সে এসে বলে—হোরেমহেব পাঠিয়েছেন।

—কেন স্ত্রীর মাধ্যমে বিবাহ প্রস্তাব?

—না।

—কিন্তু একজনকে তো বিবাহ করতেই হবে। নিজের স্ত্রী যখন নিঃসন্তান।

—আমি তোমার মায়ের ভাগনী। কোন দিন সেই সম্মান আমি পাই নি। জানি, এর জন্যে আমার দিদিই দায়ী। তবু তোমাদের প্রতি আমার বরাবরের বিদ্বেষ।

—তাই বলে বিষ প্রয়োগে ফ্যারওকে মেরে ফেলার চেষ্টাকে অনুমোদন করা যায় না। সে সম্বন্ধে আমার মনোভাবের কথা তোমাকে মন্দিরে জানিয়েছি।

—অতীতকে ভুলে যাও। বর্তমানে কি করবে বলে ভাবছ?

—কেন সম্রাজ্ঞী থাকব?

—হিতিত্তির রাজকুমার আর এসে পেঁাছোবেন না। তাঁর দেহ পড়ে রয়েছে ধু ধু প্রান্তরে।

অনখেসেন চিৎকার করে ওঠে—কে বলল?

—হোরেমহেব। সে একদল অশ্বারোহী পাঠিয়েছিল তাকে খতম করতে।

—কি করে জানল?

—বলতে পারি না।

অনখেসেন এতক্ষণে হতাশায় ভেঙে পড়ে। সে বুঝতে পারে, এমন অবস্থাতেই তার বোন মার্তের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। কিন্তু সে স্থির থাকবে। বিচলিত হবে না। কিছুতেই না।

—কি বলতে এসেছিলে?

—হোরেমহেব জানতে চেয়েছে এবারে তোমার পরিকল্পনা কি?

অনখেসেন বুঝতে পারে নির্বোধ মুতনেজেমেত বুঝতে না পারলেও ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট।

সে বলে—আমি পরশু দিনই জানিয়ে দেব।

—হোরেমহেব সেকথা ভেবেছে। বলেছে, তাতে খুব দেরী হয়ে যাবে।

—বেশ আমি কালকে জানাব।

—কালকে আমি এই সময় আসব।

অনখেসেন একটু উচ্চকণ্ঠে বলে—আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই এত নির্বোধ? কিছুই বুঝতে পার না?

মুতনেজেমেত বিষন্ন কণ্ঠে বলে—নিঃসন্তান রমণীর অনেক কিছু বুঝেও বুঝতে নেই।

সে চলে যায়।

অনখেসেন ভাবে শেষ পর্যন্ত সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা আঁকড়ে রাখতে মুতনেজেমেত-কে সপত্নী রূপে মেনে নিতে হবে? এতই ললুপতা তার। তুতনখামেনকে কি

এর মধ্যেই ভুলে গেল ? না ভোলেনি। ভুলবেও না কখনো। ভুলতে পারে না। কিন্তু অয়-এর ওই আকস্মিক রূপান্তরের কথা ভাবা যায় না। তার পর থেকে একটা প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে। নইলে কি হতো বলা যায় না।

সন্ধ্যা হতে শৈশবের সেই নিদারুণ ভীতি অনখেসেনকে পেয়ে বসে। তুতনখ-এর মৃত্যুর ক'দিন আগেও এমন হয়েছিল। আজ আবার সেই ফিস্ফিসানি, সেই ছায়া মূর্তির আনাগোনা। হয়ত বরাবরই তার মধ্যে তার পিতার উন্মত্ততার বীজ লুকিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে বল প্রয়োগ করে বাইরে প্রকাশ পেতে চায়। সে জোর করে চেপে রাখে।

একবার তুতনখ-এর দেহখানা দেখতে বড় সাধ জাগে মানে। ওই দেহ তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, অত্যন্ত পরিচিত। ওটি লুপ্ত হবে না সে জানে। কিন্তু আগের সেই সুদর্শন মাধুর্য-মিশ্রিত রূপ বজায় থাকবে না। ওকে মনে হত দেবশিশু। ওরা থাকে না এই বালুকাময় পৃথিবীতে। ওদের বোধহয় কষ্ট হয় থাকতে। এই পৃথিবী হোরেমহেব আর অয়দের বসবাসের জন্য। তুতনখামেনের বসবাসের জন্য নয়। তার উপযুক্ত স্থান অমেনের পাশে।

পরদিন প্রাসাদের কোথাও অনখেসেনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানের ধুম পড়ে যায়। অয় অতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। হোরেমহেবকে ডেকে পাঠায় প্রাসাদে। ব্যস্ত হোরেমহেব ছুটে আসে। সবাইকে ডেকে বলে, যে খুঁজে দিতে পারবে সম্রাজ্ঞীকে, তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

তারপর একসময়ে অয়কে একান্তে পেয়ে হোরেমহেব জিজ্ঞাসা করে—কেউ খুঁজে পাবে না তো ?

একটু ফিকে হেসে অয় বলে—পাগল।

একটি সদ্য কৈশোর-অতিক্রান্তা নারী পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার কাছে নিজের তীক্ষ্ম বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হল। সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পড়ে রইল তার স্বামীর মৃতদেহ স্ত্রীর স্মৃতিটুকু জড়িয়ে নিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে সবটুকু কাহিনী উজাড় করে দেবার জন্য।

———